**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : 35 B Charu Avenue, Cal-33 |
| Collection : KLMLGK | Publisher : Swapan Majumdar<br>Kali Kumar Chakraborty |
| Title : অহংকার (AHANKAR) | Size : 8.5"/5.5" |
| Vol. & Number : 3/1<br>8/ Winter Number<br>16/ Puja Number | Year of Publication : Feb- Apr 1976<br>Dec - Feb 1987-88<br>1996 |
| | Condition : Brittle / Good |
| Editor : Bhaswati Raychaudhuri | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

# অহংকার

তৃতীয় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা

॥ সম্পাদনা ॥

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

BELLE (ART & PUBLICITY)
107/2, Amherst Street,
CALCUTTA-9, INDIA

সন্তোষ কুমার ঘোষ সুনীল গংগোপাধ্যায় কবিতা সিংহ নবনীতা দেবসেন অজিত রাইরী বরুণ চৌধুরী কবিরুল ইসলাম

সাধনা মুখোপাধ্যায় কালীকুমার চক্রবর্তী সুভাষচন্দ্র গুহ কিশোররঞ্জন দে পীযূষ রাউত সঞ্জিৎ তোরুদার সুবল বিশ্বাস ও আরও অনেকে গল্প কবিতা বা নাটক লিখেছেন। নেপালী সাহিত্যিক ইন্দ্র বহাদুর রাই-এর বড় গল্প সাম্প্রতিক ঋতু অনুবাদ করেছেন দশরথি সেনগুপ্ত

মাঘ-চৈত্র তেরশ' বিরাশি

*With best compliments from*

**Barnish Large-Sized Primary Cooperative Agricultural Marketing Society Ltd.**

**DT. JALPAIGURI**

**অহংকার**

তৃতীয় বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ॥ তেরশ' বিরাশী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সম্পাদনা ॥

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

॥ দপ্তর ॥

৩৫বি চারু এভেনিউ

কোলকাতা তেত্রিশ

পরবর্তী সংখ্যার জন্যে এখনই লেখা পাঠান সম্পাদকীয় দপ্তরে অথবা ভাস্বতী রায়চৌধুরী অধ্যাপিকা ইংরাজী বিভাগ পি ডি উইমেন্স কলেজ ডাক ও জেলা জলপাইগুড়ি—এই ঠিকানায়। বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠান। সমালোচনার জন্যে বই পত্রপত্রিকা পাঠান।

॥ নাটক ॥

। শুভংকর অজয় ও দেবকী।

। কবিতা সিংহ।

॥ নেপালী গল্প ॥

। সারারাত ঝড়।

। ইন্দ্রবহাদুর রাই। অনুঃ দাশরথি সেনগুপ্ত।

॥ গল্প ॥

। নবনীতা দেব সেন। কালীকুমার চক্রবর্তী। সুভাষচন্দ্র গুহ।

॥ কবিতা লিখেছেন ॥

সন্তোষকুমার ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বরুণ চৌধুরী কিশোরঞ্জন দে দেবাশিস বসু সাধনা মুখোপাধ্যায় পীযুষ রাউত অজিত বাইরী তপোধীর ভট্টাচার্য দেবপ্রসাদ মিত্র সুরথ বিশ্বাস সরিৎ তোকদার অরুণাভ ভৌমিক প্রণব মাইতি দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কমল তরফদার উজ্জ্বল সিংহ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরুল ইসলাম।

॥ সমালোচনা ॥

পাহাড়িয়া, আমরা সত্তরের যীশু

## ॥ পাহাড়িয়া, আমরা সত্তরের যীশু ॥

তবে কেন সত্তরের যীশুরা মাত্তর চারবছর? সত্যিই কেন? তার তরতাজা চনমনে উজ্জ্বল বয়স জুড়ে কবিতা গল্প আলোচনা সমালোচনা চোখ টানে, মন টানে। রীতিমত কিছু কবিতা, ধারালো ঝকঝকে দুটি সাক্ষাৎকার, সুব্রত সেনগুপ্ত কল্যাণ সেনের গল্প আলোচনা সমালোচনা এবং একবার দুবার তিনবার পড়ার জন্য সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—'আমরা সত্তরের যীশু'র সাম্প্রতিক সংখ্যা প্রত্যাশার চাইতে একটু বেশীই দিয়ে ফেলেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যোগব্রত চক্রবর্ত্তী। সাক্ষাৎকার নিতে নিতে সাক্ষাৎকার-বিশেষজ্ঞ না হয়ে যাই, বলেছেন যোগব্রত। এই সাক্ষাৎকার দুটিই তার বিশেষজ্ঞতার নমুনা হিসাবে অনায়াসে দাখিল করা যাবে। যীশু লেখকগোষ্ঠীর গদ্য রচনায় নতুন কিছুর তাগাদা আছে। জোছন দস্তিদার অল্প পরিসরে নাটক সম্বন্ধে অত্যন্ত জরুরী কথাবার্তা খুব সরাসরি বলেছেন।

অনেক দূরের শিলং পাহাড় থেকে নেমে এসেছে পাহাড়িয়া, সতেজ পাইনের হাওয়া গায়ে মেখে। কবিতা আছে। গল্প আছে। তবে পাহাড়িয়ায় কবিতার চাইতে গল্পের জোর বেশী। মিথিলেশ ভট্টাচার্য শংকর চক্রবর্ত্তী মিহিরকান্তি রায় সকলেই গল্পে হাত পাকাতে পারেন। এদের মধ্যে মিথিলেশকে ইতিমধ্যেই বেশ খানিক অভিজ্ঞ বলে মনে হয়। আর সমরেশ দাশগুপ্তর দরজায় গিয়ে রীতিমত ধাক্কা খেতে হয়। গল্প? কবিতা? কবিতার মতো গল্প? গল্পের মতো কবিতা? যাই হোক সমরেশ দাশগুপ্তর দরজা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রাখে—খুব ভালো লেখা ॥

আমরা সত্তরের যীশু সংকলন চার-সম্পাদক: প্রতুল দত্ত সৈনিক স্কুল ক্যামপাস পুরুলিয়া।

পাহাড়িয়া/সংকলন নয় / সম্পাদক: পীযুষ ধর, শিলং।

অহংকার
তৃতীয় বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ॥ তেরশ' বিরাশী

## ভ্রমণ ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঈষৎ ধারালো রোদে কুমীরের ডিম খোঁজে
মানুষ-শিশুরা
খাঁড়িতে জোয়ার
সারি সারি কুর্মকায় ম্যানগ্রোভ ঝোপে
ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ
অদূরে অরণ্যভূমি প্রত্যক্ষদর্শীর মত স্থির
পাঙ্খাক গাছের শীর্ষে টিট্টিভের মন-কাড়া ডাক
তারই মধ্যে বেজে ওঠে ষ্টীমারের ভোঁ।

জাহাজ ঘাটার থেকে বিশ পা বাড়ালে
আবার বৃক্ষের দেশ, আবার নির্জন
বালিয়াড়ি ভেঙে ভেঙে হেঁটে যাও
ভাঙা শঙ্খ, ঝিনুক, কোরাল
পান্না রং জলে ঘোরে চুনী-রঙা মাছ
পাথরের পিঠে ধার, এখানে বসো না।

যদিও বাতাস নেই, তবুও চলায় ক্লান্তি নেই
যেন কেউ ডাকে
যেন কেউ বসে আছে বাঁকের আড়ালে—
ছিল
তীর ও জলের সীমা ঘেঁষে শুয়ে ছিল এক
পা-বাঁধা হরিণী
তখনো সামান্য প্রাণ, তখনো চোখের মধ্যে দ্যুতি
কাছে যাই
চার চক্ষু বিস্ময়ের পাল্লা দেয়
কে ওখানে, কেন ওকে, কোন অপরাধে?

ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াতেই
হামলে আসে ঢেউ
প্রতিটি পরের ঢেউ আগের ঢেউকে দীন করে
তটভূমি সরে যায়
জুতো না ভিজিয়ে আসি পিছু হটে
এবং ক্রমশ পিছু হটে, চেয়ে থাকি
জলের বিরাট জিভ হরিণীকে নিয়ে যায়
আর একটু আগেও যদি নিত
তা হলে এ ভ্রমণকারীর নিঃসঙ্গতা
আরও একটু বিধুর হতো না!

## আই-এ-এসে প্রথম স্থানাধিকারিনীকে ॥ কিশোররঞ্জন দে

তোমার চারপাশের সাংবাদিকদের ভীড়ে আমাকে খুঁজো না
সম্বর্ধনা সভায় আমার কাছে থেকে ফুল নিতে হাত বাড়িও না
ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় তোমার চোখ ঝলসে যাবার দৃশ্য দেখতে
আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো না।
তোমার প্রিয় অপ্রিয় ছবিগুলিতে
আমি ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে বসে
নির্লিপ্তভাবে কোন ম্যাগাজিনের কভার পেজে
তোমার ফটো দেখবো
দেখবো তোমার চোখের তারার আকুতি প্রকৃতি
এলিয়ে থাক চুলের ভৌগোলিক ভাঙচুর
আর বুকের কাছে ঝুলতে থাকা লকেটের সঙ্গে
শাড়ীর আঁচলের অরাজনৈতিক কথাবার্ত্তা বলার দৃশ্য।
তুমি তোমার প্রিয় পুরুষকে দিও তোমার আত্মা
প্রিয় পৃথিবীকে দিও তোমার সংগীত
প্রিয় গাছপালাকে দিও সূর্যালোক
সংবাদের কাঁধে চেপে আমাকে আরেকবার দিয়ে যেও
কবিতাতে ফ্রিজ হয়ে যাওয়া এমনি কিছু টক ঝাল মিষ্টি পংক্তি।





## শুভঙ্কর অজয় ও দেবকী ॥ কবিতা সিংহ

হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেছে একটি দূরপাল্লার ট্রেন। অসংখ্য কৌতূহলী যাত্রীদের মধ্যে তিনজনকে নিয়ে এই প্রস্তাবনা।

বিকেল গড়িয়ে আসছে সন্ধ্যের দিকে। পৌষের চষা মাঠের একটুখানি চৌকো অংশে দুলছে বাসন্তী সরষে ফুল। দূরে ছোট ছোট টিলা। একটি সোনাঝুরি গাছ। শুভঙ্কর হাতের পোর্টফোলিও আর খবরের কাগজ নিয়ে গাছতলায় গিয়ে বসলেন। দূরের ট্রেণ লাইন থেকে হেঁটে আসছেন আর একটি মানুষ। কাঁধে ঝোলা, ধুতি পাঞ্জাবী পরা। গরম তুষ জড়ানো। শুভঙ্কর সাগ্রহে তাঁকে দেখছিলেন। একটু কথা বলে সময় কাটানোর ইচ্ছে। কিন্তু কাছে আসতেই একটু লক্ষ্য করে কি যেন ভেবে নিয়ে মুখের উপর খবরের কাগজটি মেলে ধরলেন। লোকটি তখনো এগিয়ে আসছেন।

শুভঙ্কর ॥ [স্বগত] নির্মল না? চিনতে পেরেছে আমাকে?
নাঃ চিনতে পারেনি। তাহলে কি মুখ দেখাতো আর? পালিয়েই যেত। হয়ত চিনতে পারেনি,
শরীরের ওপর দিয়ে কুড়িটা বছর বয়ে গেছে—
তবু রাণীর সঙ্গে নির্মলের আর নির্মলের সঙ্গে রাণীর……
না না ভুলতে পারি না আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

অজয় ॥ কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কি অনিরুদ্ধ দাস?
দূর থেকে চেনা ঠেকল যেন! তবে বয়স হয়েছে বেশ
চাল্‌শের চশমাও উঠেছে চোখে……ভুল হ'তে পারে……

[শুভঙ্কর কাগজ সরিয়ে ভালো করে দেখে]

শুভঙ্কর ॥ বাঁচালেন! আপনি নির্মল নন। আমিও আপনার চেনা অনিরুদ্ধ দাস নই!

অজয় ॥ অনিরুদ্ধ দাস হলে খুব ভালো হ'ত। ঠিক এই পরিবেশে
এমনি বয়সে মনে মনে মাঝে মাঝে অনিরুদ্ধ দাস…
অনিরুদ্ধ দাস হলে আউড়ে যাই কিছু কিছু কথা!
ওভাবে বলেও হাল্‌কা লাগে।
সত্যি ভালো হ'ত। এত বড় পৃথিবীতে কোথায় যে হারিয়ে গেল সে!
কিন্তু নির্মল? কে সেই নির্মল যার মত আমাকে হঠাৎ দেখে

কাগজের পর্দা দিয়ে মুখ
আড়াল করছিলেন আপনি? আমি তাই আপনাকে
আরো বেশি করে, অনিরুদ্ধ ভেবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম···

শুভঙ্কর ॥ পরিচিত একজন! এককালে খুব বন্ধু ছিল
কিন্তু বন্ধু নেই আর। এমন কি হঠাৎ অনিশ্চিত কাল
ট্রেণ থেমে গেলেও শূন্য চষা মাঠে
একা বসে থাকা শ্রেয় তবু নির্মল নয় কিছুতেই নির্মল নয়···

অজয় ॥ আপনার কথা শুনে ভিতরে ভিতরে
শিউরে উঠছি এত ঘৃণা!
হয়ত অনিরুদ্ধও ওই চোখে দেখে আমাকে এখনো!
ঘৃণায় কুঁকড়ে যায় আমার মতন কাউকে
কোনো ছায়া এভাবে দেখলেও!
অথচ ভিড়ের মধ্যে, দূর গ্রামে, শহরে প্রান্তরে···
স্বগত বলেই রাখি আমার ঘোরার চাকরি সারা দেশ জুড়ে—
কখনো বিদেশে···সর্ব্বত্র তাকে খুঁজে খুঁজে
মনে হয় চকিতে হঠাৎ দেখে হারিয়ে ফেলি পর মুহূর্তেই!

শুভঙ্কর ॥ নির্মলও কি আমাকে এভাবে খুঁজে ফেরে?
না, না, রাণীর সংগে সে ত সুখে সচ্ছন্দেই
চমৎকার শান্তিতেই আছে!

অজয় ॥ রাণী? না না যে মেয়েটি ভেঙেছিল বিশ্বাস বন্ধুতা
তার নাম, তার নাম মীরা! মীরার সংগে আমি আছি
আমার সংগে আছে মীরা
কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই অনিরুদ্ধ! অনিরুদ্ধ!
জেনে যাও, আমি সুখী নই!
[ দূর থেকে একজন একহারা চেহারার মহিলা আসছেন ]

শুভঙ্কর ও অজয় ॥ রাণী না?

একসংগে ॥ মীরা না?

[ মহিলাটি আরো কাছে এলেন ]

দেবী ॥ আপনারা কি জানেন কেন ট্রেণ?···কে সঞ্জয়? অশোক?



না, না, না না! আমি ভুল করেছি···আপনারা তো
অন্য কেউ, অন্য লোক তাই না? বলুন তাই নাকি?

শুভঙ্কর ॥ আমার নাম শুভঙ্কর দাস

অজয় ॥ আমি অজয় রায়, নমস্কার! আপনি?

দেবকী ॥ আমার নাম দেবকী! দেবকী মিত্র আমি স্কুলে কাজ করি!

শুভঙ্কর ॥ বসুন না! রুমাল বিছিয়ে দিচ্ছি! ট্রেণ ছাড়তে বহু দেরী
সন্ধ্যা ঘনালে ঘোর যে যার কম্পার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে
শুয়ে পড়া যাবে। এখন গল্প হোক। সময়টা নাহলে কাটছে না।

অজয় ॥ [ বসে পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ]
কিন্তু কারা ওই সঞ্জয়? অশোক?

দেবকী ॥ তারা? একজনকে দেখলে যত সুখ, দুঃখ তারও বেশি
অন্যজনকে দেখলে শুধু মনে হ'ত কাদা ধুয়ে আসি!

শুভঙ্কর ॥ ( স্বগত ) রাণী কি এমন করে কোনে দিন নির্মলের
সংগ থেকে সরে এসে আমাকে একান্ত করে ভাবে?
রাণীর ভিতরে কোনো পাপবোধ?
কোনো অনুতাপ? জ্বালা তার
কামনার সর্ব্বগ্রাসী দহনের পাশাপাশি জলে? নাকি রাণী
দেবকীর মত এত বেঁচে নেই···লজ্জাবতীর পাতা যেন
এত স্পর্শ-সচেতন এত রোমাঞ্চিত?

অজয় ॥ ( স্বগত ) মীরা কি আমার পাশে শুয়ে শরীর কাদায় রেখে
মন ধুয়ে মনের ভিতরে একা একা সঙ্গোপনে চলে যায়
অনিরুদ্ধ তোমারই শিয়রে?
মীরা নাকি ভালোবাসত তোমার চুলের ঢেউয়ে আঙুল ছোঁয়াতে?
ভালোবাসত তোমার কপালে সিক্ত, মসৃণ গেরুয়ারঙে
ওষ্ঠ ছোঁয়াতে? কে জানে? হয়ত কিছুই নয়।
অনিরুদ্ধ! মীরা তোমার দিকের সব জানালাই বন্ধ রেখেছে···
কিন্তু আমি,···আমি কেন সুখী নই আর কেন মীরা

কিছুতেই যে স্বল্প সময় ঘরে ফিরি
সুখী সুখী মুখোশটা বার বার ফেলে দিয়ে
অজান্তেই খুলে দেয় ক্লান্ত তার মুখ !

দেবকী ॥ (অপ্রস্তুত হেসে) বাঃ গল্প করা যাক বলে দুজনেই চুপ।
গল্প ভাবছেন বুঝি ?
এও মন্দ নয় !

শুভঙ্কর ॥ কি মন্দ নয় ?

দেবকী ॥ এই চুপ করে থাকা ! এও বেশ ! আকাশ যেখানে গিয়ে টিলার সারিকে ছুঁয়ে দিচ্ছে সেখানটা লাল, সূর্য দ্রুত নেমে যাচ্ছে বিচ্ছুরিত আবীর ফাটানো ! লাল থেকে ক্রমশ ঘোর, ঘোর লাগবে বেগুনীতে নীলে···

অজয় ॥ আমাদের বয়স যেখানে সেখানেও লাল সব শেষ।

দেবকী ॥ মন্দ বলেন নি কিন্তু। ঠিক একটা সীমায় এসে লাল আর যায় না কোথাও। থেমে যায়। ক্রমশ বেগুনী হয়, মেরুন, পার্পল, তারপর কালশিটে নীল-কালো তারও পর অন্ধকার শুধু।

শুভঙ্কর ॥ অর্থাৎ আমাদের সূর্যাস্ত হয়েছে !

দেবকী ॥ অন্ততঃ আমার কথা বলতেই পারি। সূর্যাস্ত তো হয়েইছে
তারপর কোনো ভোর নেই আর তাই
প্রতীক্ষাও নেই···অনন্ত রাত্রির পর কোনো সূর্য আশাও করিনা।

অজয় ॥ আশ্চর্য ! আপনারা দুজন এত দারুণ অচেনা যে···
খুব গূঢ় কথা কিছু বলা যায় বিষম নির্ভয়ে—
স্ফটিকের পাত্রে রাখা সযত্ন ভ্রমর হেন গোপন কথাকে।
বলে ফেলি,···অনিরুদ্ধ দাস আর মীরা রায়
ভালোবাসত পরস্পর আমি বন্ধু হয়ে শত্রুতা করেছি—
দুর্বল মুহূর্তে মীরা, আমিও হিংসায়···হিংসা, কারণ
মীরা অনিরুদ্ধ ছাড়া আর কিছু জানেনি কখনো
অত ভালোবাসা দেখে নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হল
শিশুরা লোভীর মত যে ভাবে পাপড়ি ছিঁড়ে চক্রমল্লিকার—
ওড়ায় সৌন্দর্য সব !



মীরাকে দখল করে তবে তৃপ্ত হই,
অনিরুদ্ধ ঘৃণায় অপসৃত···জানিনা কোথায়···

শুভঙ্কর ॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে) এত তৃপ্ত যদি তাহলে খোঁজেন কেন অনিরুদ্ধকে ?

অজয় ॥ তৃপ্তি তো আহারে হয়। আহারে বিহারে। কিন্তু সুখ ?
সুখ দূর অস্ত্···আমি বলতে চাই এইটুকু শুধু
বন্ধুতাকে হত্যা করে অনিরুদ্ধ আমি সুখী নই।

শুভঙ্কর ॥ নির্মল কি এই কথাই আমাকে বলতে চায় ?
সে কি খোঁজে এভাবে আপনার মত ভিড়ের ভিতরে একা
বিষণ্ণ আমাকে ! আর রাণী ?
কেউ বলে রাণী আছে নির্মলের কাছে ! কেউ বলে
রাণী নাকি চলে গেছে ভুল ভেঙে একা অন্যখানে
রাণী নাকি একা থাকে দূরের শহরে কিংবা কোনো ছোট গ্রামে !

দেবকী ॥ হতে পারে !

শুভঙ্কর ॥ কী ?

দেবকী ॥ আপনার কাহিনীটিও সংক্ষেপে জানা হয়ে গেল
হতে পারে ! যেমন আমার হয়েছিল !
সঞ্জয়কে ছেড়ে দিয়ে একা অসহায়
আমি গেছি অশোকের সচ্ছল সংসারে
অশোক কি দেয়নি আমাকে ? সব। পত্নীত্বের স্বীকৃতি ?
তাও দিয়েছিল !
কি ভাবে সে সঞ্জয়ের মন ও হৃদয়
মুচড়ে দিয়ে এনেছিল মুক্তির সনদ !
তবু স্বপ্নেও ভাবিনি যা তাও ঘটে গেল
বুকের ভিতরে দুলল কেবল সঞ্জয়,···বাইরে
ঝড়ের দোলায় শুধু বেচারী অশোক
দোলালো শরীর আর দেহের যৌবন।

( স্তব্ধতা )

এখন বয়স এসে নিয়ে গেছে যৌবনের সব বেনোজল
আরও আগে এসেছিল করুণ বাঁশির মত একহারা একলা আলাপ

অদ্ভুত ক্রন্দন এক, সঞ্জয়ের জন্য গলাচাপা
আকুলতা ! সঞ্জয়কে কত ভালোবাসি
তার কাছে কত অপরাধী
সে অপরাধের ক্ষমা নেই,···চাইলেও ক্ষমা···সঞ্জয় সঞ্জয়
রোজ তাকে চিঠি লিখি মনে মনে কোয়ার্টারে একা একা শুয়ে
সঞ্জয় ! ক্রমশ বুঝছি কত ভালোবাসি যে তোমাকে
তুমি কিছুতেই ক্ষমা কোরোনা তো ! মনে মনে তোমার সংগে গড়ি
আমার জগত ! বড় সুখ !
কারণ এ সঞ্জয় ঘৃণাহীন কেবল প্রেমিক
আমার রচনা আর ঘৃণা !
ঘৃণা হয় অশোকের আপাদমস্তক ভেবে, দেহ মন সমস্ত মিলিয়ে
আর ঘৃণা হয় নিজের উপর !

শুভঙ্কর ।। দেখুন সূর্যাস্ত হ'ল, তবু অন্ধকার ক্রমশ শান্তি আনছে
অনর্গল স্নিগ্ধ সুবাস

অজয় ।। মাঠে কারা পাতা জ্বালছে, সোঁদা গন্ধে অদ্ভুত বাতাস।

শুভঙ্কর ।। আমরা তিনজন শুভঙ্কর অজয় দেবকী।
আমরা কেউ নির্মল বা অনিরুদ্ধ নই, অশোকও না সঞ্জয়ও না

দেবকী ।। মীরা বা রাণীও !

অজয় ।। তবু ওরা এবং আমরাও মিলে মিশে আছি !
কাহিনী কিছুটা পাল্টে মূলে এক, ভালোবাসা, বিশ্বাসঘাতকতা
বন্ধুতার হন্তারক পাপ,···অনুতাপ···উপলব্ধি সবার উপর

দেবকী ।। প্রেমহীনতার বোধ, কিংবা তীব্র প্রেম

অজয় ।। ( উঠে দাঁড়িয়ে ) আপনারা থাকুন আমি চলি।

শুভংকর ।। কেন ?

দেবকী ।। হঠাৎ ?

অজয় ।। আপনাদের সান্ত্বনা রয়েছে।
যেমন শুভংকর আপনি ত ভাবতেও পারেন,
রাণী আছে একা অনুতাপে, দেবকীর মত একা
দুঃখের দহনে জ্বলে নিখাদ উজ্জ্বল !



নির্মলকে চাননা আপনি
রাণীকে তো স্বপ্নে গড়েন রোজ ভাবনায় খুঁতহীন করে।
আপনি দেবকী !
আপনিও চান না সঞ্জয়কে সশরীরে—
ঘৃণায় বাঁকানো ওষ্ঠ ক্ষমাহীন একাকী সঞ্জয়
অশোকও কাম্য নয় আপনার !
কিন্তু আমি, আমাকে দেখুন এক পাপী
এক কর্দমাক্ত পতিত মানুষ
পাগলের মত আমি ভিড় থেকে ভিড়ে
অনিরুদ্ধ-অনিরুদ্ধ-অনিরুদ্ধ করে···
আমার তো মুক্তি নেই
মুক্তি নেই সংগে বাঁধা পাপের শৃংখলে
বেচারী মীরারও···
চলি, বিদায় বিদায়···
ওই দূরে ভিড়···এ ট্রেণ ছাড়ার আগে আমি ওই ভিড়ে যাবো
খুঁজে দেখবো যদি পাই তাকে, শুধু বলব
অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ জেনে যাও মীরা আর আমি সুখী নই
সুখী নই আছি বাঁধা পাশব শিকলে···
( কণ্ঠস্বর ও অজয় অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে )

LA-BELLE (ART & PUBLICITY)
107/2, Amherst Street,
CALCUTTA-9, INDIA

: স্তব্ধ—দেবকী ও শুভঙ্করের বসে থাকা চিত্রটির উপর থেমে
আসবে নীল জ্যোৎস্না ও যবনিকা।

## ফুস্কুড়ি ॥ নবনীতা দেব সেন

দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেলো ফুস্কুড়িটা। বাঁদিকে, কানের একটু নিচে, চোয়ালের ওপরের ছোট্ট শাদা বিন্দুটা টকটকে লাল একটি বিন্দুতে পরিণত হলো। তারপর টস করে গড়িয়ে পড়লো তোয়ালের ওপরে। সত্যর একটু বিরক্ত লাগলো, হাতটা এখনও ঠিক নেই, আরেকটু ঘুমুলে হোতো, চোখে এখনও ঘুম রয়ে গেছে। দাড়ি কামানোর পর ডেটলটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলোনা—মা তুলো আর টিংচার আয়োডিনের শিশিটা এগিয়ে দিলেন। একটুও পছন্দ হোলো না বটে তবু সত্য আয়োডিনে ভেজানো তুলোটা চেপে ধরলো গালের ওপর, যেখানে কেবলই গোল গোল রক্তের দানা ফুটে উঠছে। বিরক্তিকর। এবার দেবে শার্টটা নষ্ট করে। আয়োডিনের তুলোটা গালে ছোঁয়ানোর আগে আপনা আপনি সত্যর চোয়ালের পেশী শক্ত হলো, চামড়াও প্রস্তুত হলো কিঞ্চিৎ জলবার জন্যে। সত্য আয়নার দিকে চেয়ে তুলোটা ঠিক লাল পুঁতিটার ওপর টিপে ধরলো। মুহূর্তের জন্য নিজেকে বীর, কষ্টসহিষ্ণু, শহীদ জাতীয় কোনো মহাপ্রাণী বলে মনে হলো—ছেলেবেলা থেকেই আয়োডিন লাগানোর সময়ে এই আত্মতৃপ্তিটা বোধ করে সত্য।

অথচ, গাল জ্বালা করলো না।

ফুস্কুড়িটা যখন কেটে গেলো, তখনও ব্যথা লাগেনি। ব্লেড নতুন বলে বোধহয়। আয়োডিন লাগানোতেও চামড়া চিন্‌চিন্‌ করলো না, একটা ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগলো মাত্র। একটু অবাক হলেও সেদিকে বেশি মন দিলো না সত্য—আজকাল সবেতেই ভেজাল। কে জানে আয়োডিন বলে কী চালিয়ে দিয়েছে! সেই শুরু।

পরের বার সত্য ব্যাপারটা খেয়াল করলো, যখন চায়ের জলটা তাড়াহুড়ো করে নামাতে গিয়ে ললিতা খানিকটা ফেললে নিজের হাতে আর বাকিটা সত্যর পায়ে। ললিতা তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলো বাপ্‌রে মারে করে, মা ছুটে এলেন, বার্নল এলো, বকুনি এলো, ললিতার পরিচর্যা শুরু হলো। একসময়ে সত্যর পায়ের দিকে চোখ পড়তে ললিতাই আর্তনাদ করে উঠলো.—দাদা! তখন সত্য দেখলো বাঁ পায়ের পাতার ওপরদিকটা বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে



উঠেছে। দৃশ্যটা দেখে, সত্যর রাজা কন্যাষপাদের গল্পটা মনে পড়ে গেলো। মা কাঁদতে লাগলেন। সত্যর পোড়াটাই বেশি। রিকশায় করে ডাক্তারখানায় পাঠানো হলো ভাইবোনকে। প্রায় মাসখানেক ছুটি নিতে হয়েছিলো পায়ের জন্যে। যতোবার ঘা ড্রেসিং করানো হতো, ললিতা চেঁচাতো, কিন্তু সত্যর মুখে রা-টি নেই।

সবাই, ইনক্লুডিং ডাক্তারবাবু, বললেন—উঃ কী সহ্যশক্তি ছেলের। এমনটি দেখা যায় না!

কেবল সত্য ভাবলো আর একরকম।

সত্য খুব অবাক হোলো।

কারণ সত্যই কেবল জানলো যে সহ্যশক্তির প্রশ্ন ওঠেনা। সত্যর পায়ে লাগেনি। পুড়ে যাবার সময়েও না, ঘা ড্রেস করার সময়েও না।

সত্য চেঁচাবে কেন? ভদ্রভাবে, হাসিমুখে সে-ই বা ডাক্তারবাবুর কুশল-প্রশ্ন করবেনা কেন, যখন বেচারা ডাক্তারবাবু একমনে ঘা সাফ করতে ব্যস্ত?

তার পরের বার, যখন বাবার চাকরিটা চলে গেলো। বিশ বছর ধরে যে কেউ টেমপোরারি চাকরি করতে পারে তা কে জানতো। বাবার চাকরি নাকি কোনোদিনই পাকা হয়নি। আর সেই জন্যে পেন্‌শনের প্রশ্ন নেই। কি সব গোলমালের জন্যে প্রথমে স্ট্রাইক, তারপরে লম্বা লক-আউট চলছিলো। যেই লক-আউট তুলে নেওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে এলো ছাঁটাই। বাবা তো একাই নন, গিরিধারী কাকা, অনিলবাবু, সুরেনবাবু, সকলেই নাকি বিশ বছর ধরে টেমপোরারি। সকলেরই চাকরি গেলো। ঘটনার আকস্মিকতায় বাবা মা ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কিন্তু খুব ঝট্‌ করে সামলে উঠলেন, যখন, এর ঠিক দুদিন বাদেই, গিরিধারীকাকা মাঝরাত্তিরে উঠে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লেন। কাকীমা দু'মাস ধরে ক্যানসার হাসপাতালে। গিরিধারীকাকার প্রায় অন্ধ বুড়ী মা নাতিনাতনীগুলোক বুকে নিয়ে বারান্দায় থম হয়ে বোবার মতন বসে রইলেন। পুলিশ এলো। বাবা, সুরেনবাবু, অনিলবাবু, সবাই দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলেন। সত্য সব দেখলো। সত্যও প্রচণ্ড ছুটোছুটি করলো। মর্গ, থানা, শ্মশান, ক্যানসার হাসপাতাল। অক্লান্ত, অন্তহীন যাতায়াত। সবাই ভীষণরকম বিচলিত, এক সত্য ছাড়া। সত্য স্থির, কেবল সত্যই শান্ত। বড়োদের পর্যন্ত পরামর্শ, উপদেশ দিচ্ছে,

সবিনয়ে, শান্ত হয়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে। সত্যি এমন ছেলেও যে আজ-কালকার দিনে হয় তা কে জানতো। গিরিধারীকাকাদের তো যা হবার হলো, মাঝখান থেকে ঠাণ্ডামাথা, কর্তব্যপরায়ণ, হীরের টুকরো ছেলে বলে সত্যর জয়-জয়কার পড়লো চেনা মহলে।

কেবল সত্যই জানলো।

কেবল সত্যই বুঝলো, গিরিধারীকাকার ওই জিব-বেরিয়ে-পড়া ঝুলন্ত দেহটা দেখে তার শরীরে ন্যক্কার ছাড়া কিছু হয়নি। চোখে ছানিপড়া ওঁর বুড়ী মাকে অমন জন্তু-জানোয়ারদের মতো বাচ্চাগুলোকে জাপটে ধরে বসে বসে নিঃশব্দে বিড়বিড় করতে দেখে সত্যর গা ঘুলিয়ে উঠেছিলো, এই পর্যন্ত।

কেবল সত্যই জানে, 'মনের ভাব মনেই চেপে রেখে যে অসামান্য কর্তব্য-পরায়ণতা' করতে তাকে জগজ্জনে দেখেছেন, আসলে সত্য ঠিক তা করেনি। মনের ভাবটা চেপেছে ঠিকই, তবে ভাবটা ওঁরা যা ভেবেছেন তা নয়।

সত্যকে চোখের জল চাপতে হয়নি।

সত্যর চোখে জল আসেনা।

শ্যামলীর যেদিন বিকেলে সাদার্ণ এ্যভিনিউর মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেলো. চোখে জল এসে গেলো, শ্যামলী তার কালো ব্যাগ খুলে খুদে রুমাল বের করে নাক ঝাড়বার অছিলায় লুকিয়ে চোখ মুছলো। মুছতে মুছতে খুব আস্তে টালিগঞ্জ ব্রিজের দিকে হাঁটা শুরু করলো, সত্য তখনও ট্রাম লাইনের ঠিক ওপারটাতে একটা ছোটোমতন অন্ধকার দোকানে বসে বসে চা খেলো। শ্যামলীর দিকে চেয়ে চেয়েই চা-টা খেলো। শ্যামলী জানলো না।

তারপর যেদিন শ্যামলীকে কুমারের গাড়িতে দেখা গেলো জাপানী জর্জেট পরে, ললিতা বাড়ীতে এসে ফেটে পড়লো,—তুই বাবা পারিসও, দাদা! শ্যামলীদিটা যেন কী হয়ে গেছে! তোর রাগদুঃখু কিছুই কি নেই? সেই পেট মোটা নেপালী বুদ্ধ নাকি তুই? কিছু করবি তো?

সত্য তখন নিবিষ্টমনে ধোঁয়া দিয়ে একটা শৃঙ্খল বানানোর চেষ্টা করছিলো তক্তপোষে চিৎ হয়ে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো খাবি খাওয়া মুখ করে। মা রান্নাঘরে। বাবা গড়িয়াহাটের মোড়ে টেবিল পেতে বসেছেন ভাড়া-



করা টাইপ রাইটার নিয়ে। কিছুতেই তাঁকে ঘরে রাখা যাবে না। সত্য তো কিছু একটা খারাপ কাজ করে না. ওদের চলে যাচ্ছেনা তাও নয়। ললিতাও বিন্দুবাসিনীতে মাষ্টারি পেয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। বাবার এভাবে গড়িয়াহাটে বসাটা ললিতার কাছে খুব একটা লজ্জার ব্যাপার হয়েছে। সত্যর সঙ্গে রোজই এই নিয়ে রাগারাগি কান্নাকাটি করে মেয়েটা। সত্য উদার, বৈজ্ঞানিক সুরে বলে, কেন তুই তোর ইচ্ছেটা বাবার ওপরে চাপিয়ে দিবি? তাঁর তো ব্যক্তি হিশেবে আলাদা অস্তিত্ব আছে, তোমার বাবা হওয়াই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। ওঁর যদি এতে মন ভালো লাগে ওঁকে বসতে দে। এই বয়সে যতদিন কর্মক্ষম থাকেন ততই ভালো।

মা-ও এই ব্যাপারে সত্যর বিপক্ষে। মা রাগ করেন,—রোজগেরে ছেলে হয়ে তুমি নিজে যদি বারণ না করো, বুড়ো বাপ এই বয়েসে ফুটপাতে বসে পয়সা উপার্জন করছেন, এতে তোমারই মুখ ছোটো হয়।

মা জানেন না. সত্যর মুখ ছোটোবড়ো কিছুই হয়না। বাবা ফুটপাতে বসে ভিক্ষে করলেও সত্যর মুখ ছোটো হবে না। ললিতা বিন্দুবাসিনীতে চাকরি পেয়েছে, ভালো। তা না করে সে যদি আর-কিছু করতো, সেও যদি ফুটপাতে গিয়ে পয়সা রোজগার করতো, সত্যর তাতেও কিছু এসে যেতো না। সত্যর ওসব ঝামেলা নেই।

ললিতাও জানেনা। শ্যামলীকে দেখেছে সত্যও। লেকের ধারে অন্ধকারে কুমারের গাড়ীটা পার্ক করা ছিলো। সত্যর কিছুই এসে যায়নি। অনেক-দিনই সত্যর কষ্টফষ্ট হয় না।

চিৎ হয়ে শুয়ে গোল হাঁ করে ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সত্য ভাবলো, গিরিধারীকাকার বদলে, এখানে যদি বাবার শরীরটা ঝুলতো জিব বের করে, আর এই বারান্দায় যদি সত্যর মা বসে থাকতেন ললিতাকে জড়িয়ে ধরে, সত্যর তাতেও কিছু এসে যেতোনা। সে অমনিই নির্বিকার, কর্তব্যপরায়ণ, ধীরস্থির যুবক হয়ে ছুটতো, মর্গ, থানা, শ্মশান, কোর্ট, কাছারি। মনে মনে ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পায় সত্য—বাবা এই পাখার পাশে ঝুলছেন, মা উবু হয়ে এই দাওয়ায় বসে আছেন, মার বুকের মধ্যে ললিতা ভয়ে কাঠ—দেখেও ওর মনে কষ্ট টষ্ট হয় না। মনে মনে সত্য এবার দিব্যি দেখতে পায়, কুমারের কেয়াতলার ফ্ল্যাটে ফোমের বিছানায় শ্যামলীর

বর্ষার লাউডগার মতন তরতাজা শরীরটা এলায়িত, এবং হাসিখুশি, যেন রাজেশ খান্নার কোলে শর্মিলা ঠাকুর। সত্যর কিছুই মনে হয়না।

ফুরিয়ে-আসা সিগারেটটা ফেলবে বলে উঠতে গিয়ে সত্য দেখলো পায়ের কাছে ভোলাটা এসে গুটি গুটি শুয়েছে। এককালে রাস্তা থেকে সত্যই কুড়িয়ে এনেছিলো। ব্রাউন গায়ে শাদা শাদা দাগ, কাজলপরা চোখ—নেড়িকুত্তা হলে কি হবে ললিতা বলে ওকে নাকি ঠিক হরিণের মতো দেখতে।
—আচ্ছা, ভোলার গায়ে শাদার বদলে কালো কালো দাগ হলে কেমন দেখাতো? বাঘের মতো কি? মনে হওয়া মাত্র সত্য পা গলিয়ে খুব শক্ত করে মেঝের সঙ্গে টিপে ধরলো ভোলার গলার বক্‌লসটা, আর সিগারেটের জলন্ত টুকরোটা চেপে ধরলো ওর নরম ব্রাউন মাথায়।
ভোলার প্রচণ্ড আর্তনাদে মা রান্নাঘর থেকে আলুথালু দৌড়ে এলেন, ললিতা কলঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো?
শান্ত হেসে, মার্জিত গলায় সত্য বললো,—ও কিছু নয় মা, তুমি যা করছিলে করো গে যাও।

## রক্তকার ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

অহংকার। এক আউন্‌স্‌. না একটি দিনের?
দিন যায় দিন আসে, চিঠি না, দেখা না,
বলা না, না মানে না, না, না।
—কিচ্ছু না।

কিন্তু গ্যাঁট একটু অহংকার কিনতে কত যে খরচ, কত যে! নিরুপম হে ঈশ্বর, সেই দম্ভটুকুর দাম বুকের কত সি-সি যে রক্ত, তুমি জানো নাথ, তুমি জানো।

এত মূল্যবান অহংকার যা হাতির সমানা, তাকে পোষা সাধ্যাতীত। কোনও বুড়ো শালিখ তাই গলা ফুলিয়ে ব্যোম্‌ বসে থাকে। তার ঘাড়ে রোঁ, তো বুবয়েই গেল, তার তরুণী অহংকারকে নিয়ে ডংকা মেরে তার শোয়া-বসা, যস্যার্থ সহবাস, মানে কিনা না ঘুমোনো, মানে কিনা নির্বাধ,



নির্বিকার সব কিছু, লোকলোচনকে কেয়ার করা থোড়াই, মোটমাট ওই অহংকারটা অর্থাৎ নিজের কোটে নিজে থাকা চাই।

চাই। চাই। চাই। অহং মানে সে যে নিজে, সেটা সে নিজে জানে। কিন্তু তার অহংকারটা কার? জানাটা জরুরী, তবু বুড়ো শালিখটা জানবে কী করে। লেখাজোখাহীন ক্ষরিয়ে দেবার মতো রক্ত কই, তার বুকে কই—অন্ধকার অহংকার, রক্তকার!

## কালবেলা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

এ এক অবিশ্বাস্য পৃথিবী, যেখানে নিত্য শ্বাস নিচ্ছি, মানে নিতে হচ্ছে। হয় কিছু প্রাণী, কিছু শ্রেণী, কিংবা বলা যায় কোনও নাটকের কিছু কিছু কুশীলব হঠাৎ ঢুকে পড়েছে পূর্বতর কোনও দৃশ্যে, অর্থাৎ কিনা যখনই, যখনও, তাদের প্রবেশের কথা ছিল না। তাদের চিনি না। তার চেয়েও বড় কথা, তাদের বুঝি না। অথবা, কে বলতে পারে, তারাই এসেছে সঠিক সময়ে, নির্ধারিত অঙ্কে বা দৃশ্যে। আসলে আমার—আমাদের মতো বাসী জন কয়েকেরই থাকার কথা ছিল না; কিছু বুঝি না, কিছু জানি না তবু অথর্ব বসে আছি—স্ব-কালকে অতিক্রম করার অপরাধে অপরাধী বিকালবিলাসী? নাকি আরও ক্লান্ত করুণ করি—করব? এই গ্রহে আমরাই হয়তো আজ কতিপয় অনধিকারী প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী। কায়ক্লেশে টিঁকে আছি। অন্যেরা যাদের নাম জানি না মুখ দেখি না — আছে; রোমশ অন্ধকারে আরও কর্কশ, লা-লা-লা-লা প্রাণের কষ-গড়ানো দেমাকে ক্রমশ প্রধান হচ্ছে। তাহে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আত্মক্লেশ? অবৈধ বেঁচে থাকার কোন্‌ যৌক্তিকতা জাহির করব সেই আত্মার আমার আত্মার কাছে—নিজের কাছে নিজে কাঁচুমাচু তথা তোৎলা কৈফিয়ৎ পেশ করব কী? কী-কী-কী?

## ॥ নেপালী সাহিত্যিক শ্রীইন্দ্র বহাদুর রাই ॥

শ্রীইন্দ্র বহাদুর রাইএর জন্ম ১৯৩০ সালে দার্জিলিংএ। নেপালী ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবীন গল্প লেখকের মধ্যে ইনি একজন। তাঁর প্রথম গল্প ১৯৫৯ সালে লেখা 'রাত ভরি হুরী চলো'। ঘনবাদী (Cubistic) ও অমূর্তবাদী (abstract) বিধিতে লেখা তাঁর গল্পগুলি নেপালীতে আয়ামিক ( dimensional ) সাহিত্য নামে খ্যাত। প্রথম শ্রেণীর দশ খানা গল্প লিখলেই যথেষ্ট মঞ্চে করে শ্রীরাই পঁয়ত্রিশ খানা গল্প লিখে আর গল্প লেখা বন্ধ করেছেন।

'আজ রমিতাছ' গল্পে ভারতীয় নেপালী জীবনের আলেখ্য এঁকেছেন। তাঁর 'টিপেকা টিপন্নী হরু' নামে নিবন্ধ সংকলনে নেপালী গদ্যের চমৎকার রূপরীতি বহুমুখি রুচি প্রকাশ পেয়েছে। 'কথাস্থা'তে শ্রীরাই সাহিত্যিক সিদ্ধান্তকারের ভূমিকা নিয়েছেন। আয়ামিক সাহিত্য সিদ্ধান্তের মুখ্য প্রতিপাদক তিনি।

'নেপালী উপন্যাসকা আধার হরু'তে শ্রীরাই নেপালী উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান সমালোচক। 'সন্দর্ভ মা ইশ্বর বল্লভ কা কবিতা'তে তিনি এক আধুনিক নেপালী কবির রচনার সমালোচনা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরাই একজন কৃষক ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। সার্ব্বজনীক জীবনে ইনি দার্জিলিং নগরপালিকার লোকপ্রিয় উপাধ্যক্ষ ছিলেন ও নেপালী সাহিত্য পরিষদ, দার্জিলিং-এর সংস্থাপক অধ্যক্ষ আছেন।

নেপালী গল্প

### সারারাত ঝড় ॥ ইন্দ্রবহাদুর রাই

অনু : দাশরথি সেনগুপ্ত

ছাতে ছাওয়া কেরোসিনের পেটানো টিনগুলি আবার দমকা হাওয়ায় খট্-খটাং, খট্-খটাং করে বেজে উঠছে। নড়বড়ে ছাদটা উড়ে যাওয়ার ভয় মনের মধ্যে শির শির করে ওঠে।



ফাঁক ফোকর দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে পড়া হাওয়ায় লম্ফের আলো কাঁপে। সেই কম্পিত শিখার ধূম্রমলিন আলোয় দুটো শঙ্কিত মানুষ—কালের বাবা আর মা—বাঁশের দুর্বল ঠ্যাকনা দেওয়া ছাদের দিকে তাকায়। কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় টিনগুলো কালো। তাদের গায়ে জলবিন্দু, পরিশ্রান্ত স্বেদবিন্দুর মতো। ধুপিসি এবং অশথ কাঠের কালো লম্বা কালিগুলো চেপ্টা পেটানো টিনের পাতগুলোকে হাওয়ার আক্রমণ থেকে কোনক্রমে ধরে রেখেছে। ধরে রেখেছে, কিন্তু আর বোধহয় পারছে না।

"পাহাড়ের এদিকটাতে ঝড়ের কি দাপট রে বাবা!" হঠাৎ মন্থর হাওয়া টিন বাজানো বন্ধ করলে কালের মা বলতে বলতে উঠল—এক চিলতে উঠোনে একটু আগুন জালবার ব্যবস্থা করতে।

"চট করে থামবে না," কালের বাবার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল। "এক সপ্তাহ ধরে চলছে।" বলতে না বলতেই আবার ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল। "এরকম জল হলে ধ্বস নামতে পারে। এ জায়গায় বাড়ি করাই ভুল হয়েছে।"

বৃষ্টির বেগ বাড়তে থাকে। চালের টিনের অবিশ্রান্ত আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়। একপাশ ঢাকা উঠোনে আগুনের শিখা লকলকিয়ে ওঠে। হঠাৎ ছোটখাটো সব শব্দ ডুবিয়ে এক বিরামহীন গুড় গুড় গুড় গুড় আওয়াজ চারদিক ছাপিয়ে ওঠে। সব যাবে, ভাঙবে, ধ্বসে যাবে……এ বাড়ি ঘর থাকবে না, আমরা থাকবনা …… "হে মহাকাল বাবা! রাখতে তুমি মারতেও তুমি!"

বাতাসের তোড়ে বৃষ্টির ছাট বারে বারে ভিতের তক্তাগুলোকে আঘাত করে। তক্তাগুলোর ভিতরের দিকও ভিজে ওঠে। এক কোণে কালে তার ছোটবোনকে জড়িয়ে মুড়ি সুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

"তোর জেদেই এ জায়গায় ঘর বানালাম।" কালের বাবার রুষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়। "কি আরামের পুলিশের কাজ ছিল। বাজারের মধ্যে পাকা বাড়িতে থাকতাম। না ঝড় বৃষ্টিকে ভয়, না ধ্বস নামার ভয়।"

কালের মা এ সব কথার কোন জবাব দেয় না। তবু কথা শুনতে হয়। "খুব বাড়ি বানানেওয়ালী হয়েছিস্! সব খেয়ে বসে আছিস।" কালের বাবা রাগে গড়গড় করতেই থাকে।

"তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো না! আষাঢ়ে বৃষ্টি এরকম হবেই। প্রত্যেক বছরই হয়! কি করা যাবে? মরতে হলে মরব, কাল ফুরুলে পরে……।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার কালের বাবার ক্রুদ্ধ স্বর, "কাল খুঁজে বেড়াস, হতভাগী! মরণে টানছে তোকে।"

বৃষ্টি ক্রমশঃ কমে এল। টিনের ধার দিয়ে পড়ন্ত জলের টুপ্‌টাপ্‌ শব্দও শোনা যায়। মগে করে বউয়ের হাতে তৈরী চা খেতে খেতে কালের বাবা প্রশ্ন করে, "কটা বেজেছে মনে হয়?"

"কি জানি? এগারটা কি বারটা হবে হয়ত!" হাই তুলতে তুলতে কালের মা উত্তর দেয়।

চা খেয়ে কালের বাবা ওঠে। দেয়ালের কাছে রাখা চুঁইয়ে পড়া জলভর্তি বাসনে পায়ের ধাক্কা লাগে, চারদিকে জল ছিটিয়ে পড়ে। "চোখের মাথা খেয়েছ না কি?" বলতে বলতে কালের মা উঠে ভিজে মেঝেতে চটের থলি বিছিয়ে দেয়।

দরজার বাইরে গাঢ় অন্ধকার। রুংতুংগ্‌ ঝোরার জলীয় গর্জন। মাঝে মাঝে অন্যরকম শব্দও শোনা যায়। হয়ত কোন গাছ ভেঙে পড়েছে বা ধ্বস নেমে রুদ্ধগতি ঝর্ণা কোথাও হলদে হয়ে উঠেছে। সবটাই অনুমান অবশ্য। অন্ধকারে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

বাইরে থেকেই হঠাৎ কালের বাবা চেঁচিয়ে ওঠে, 'টর্চ আনো, টর্চ আনো জলদি।" কালের মা একছুটে শিয়রের কাছ থেকে কালো পুরনো টর্চটা এনে দেয়।

"গোয়ালঘরের সব টিনের পাত উড়িয়ে নিয়ে গেছে রে!" নীচের দিকে টর্চ ফেলে কালের বাবা চেঁচিয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টির মতো রশ্মিরেখা ভেজা মাটি এবং ঘাসের ওপর আন্দোলিত হতে থাকে। স্বামীর পেছনে কালের মা-ও এসে দাঁড়ায়।

দু' জনে গোয়ালে ঢোকে। অসহায় ভঙ্গীতে মাটিতে পড়ে থাকা গরুটি, মনে হয় কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়ে 'হাম্বা' রবে স্বাগত জানায়। উঠে দাঁড়ায়। জলে ভেজা লোমগুলি পিঠে লেপ্টে আছে।

টিনের পাতগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনে কালের বাবা চালের ওপর ওঠে। টুকরো টিনগুলো সাজিয়ে, তার ওপর পাথরের চাঁই চাপিয়ে চাল মেরামতের



চেষ্টায়। কালের মা শ্যাওলা-ধরা বড় বড় পাথরের যোগান দিতে থাকে। আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

কালের বাবা বলে ওঠে, "তুমি এখন যেতে পার। আমি কাজ শেষ করে একটু ঘাসের ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি।"

"তোমার শেষ হোক। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

"ঠিক আছে। তুমি তাহলে একটু ঘাসের যোগাড় কর। আমি এটুকু ঠিক করেই……আরে, টর্চ দেখাবে কে আমাকে? দাঁড়াও, আমার শেষ হয়ে এল।"

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কালের মা। শাড়ি, ওড়না, শরীর ভিজিয়ে জল ঝরতে থাকে। চাল মেরামত কোনক্রমে শেষ করে কালের বাবা নেমে আসে। তাড়াতাড়ি কিছু ঘাস যোগাড় করে গরুর সামনে রেখে দুজনে ঘরে ঢোকে।

মেয়ে বৃষ্টি এল। ঘরে ঢুকে দুজনে কাপড় বদলায়। মনে হয় নাটকের দুটি চরিত্র—নতুন কোন দৃশ্যে নামবার জন্য তৈরী—নিভন্ত আগুন উস্‌কিয়ে শরীর শুকোচ্ছে, সেঁকে নিচ্ছে।

"চা আছে?"

"এখন ঘুমুবেনা?"

"তুমি শোও। আমার জন্য একটু চা চাপিয়ে রেখে দাও।"

কালের মা কালো কেৎলিতে মগে ভরে জল ঢালে। আগুনের ওপর বসিয়ে দেয়। কালের বাবার দৃষ্টি এতক্ষণ কড়ি বরগায় আটকে ছিল। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে শিয়রের কাছে মাল বইবার জন্য রাখা লম্বা দড়িটা নিয়ে 'ধ্রুপিসি' কাঠের বরগার সঙ্গে একটা দিক বাঁধতে থাকে। অন্য দিকটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বউকে যাঁতাটা আনতে বলে।

"কেন?"

"দেখছ না হাওয়ার দাপট?"

কালের মা ভারী যাঁতাটা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে দেয়। যাঁতার সাথে দড়ির একটা দিক বেঁধে কালের বাবাকে একটু নিশ্চিন্ত মনে হল। ততক্ষণে কালের মা কেৎলির জলে চা ফেলে দিয়ে বিছানায়—অর্থাৎ বাঁশের মাচানে ওঠে। কালের বাবা বসেই থাকে। চোখে ঘুম নেই। মনে চিন্তা। সে

চিন্তার ঘোর ভাঙল ফুটন্ত জল আগুনে ছিটকে পড়ার শব্দে। চা তৈরী করতে বসতে না বসতেই আবার শোঁ শোঁ করে দমকা হাওয়া। টিনের চালে আবার খটাং ঠং আওয়াজ। নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ের চোখে আর মনে আবার ভয়ের সঞ্চার।

রাত্রির গভীরে ঝড় বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ পরিশ্রান্ত—শান্ত হয়ে এল। দুটি চিন্তিত চোখে ঘুম আর নামে না। দিনের বেলায় পোতা মূলোর বীজগুলো হয়ত সব ভেসে গেছে। বাড়ির পিছন দিকের মাটি হয়ত নেমে এসেছে, ভেঙে পড়ছে গাঁদার কচি গাছগুলো। সকালে উঠেই পাশের ঝোপ-ঝাড়ে নালা কেটে দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চোখে একটু ঘুম এসেছিল হয়ত-বা। আবার দমকা হাওয়ার সাথে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি! ঘর বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাবে নাকি? চালটা কি রকম নড়বড় করছে দেখ! বাড়ির চারপাশের গাছগুলো হাওয়ার আঘাতে ক্রুদ্ধগর্জন করছে মনে হয়।

বউকে ডেকে কালের বাবা বলে, "আবার ঝড় আরম্ভ হলো রে মাইনা (মেজ)! কি যে করি?" কালের মা কোন উত্তর দেওয়ার আগেই গুড় গুড়, ধম, ধপাস শব্দে খুব কাছে কোথায় যেন ধ্বস নামলো—মনে হল শিয়রের কাছেই।

"কি হোল রে? ওঠ্, সব ওঠ্" বলতে বলতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে কালের বাবা দরজা খোলে। পেছনে কালের মা। টর্চের আলোয় দেখা গেল উঠোনের একটা দিক ধ্বসে পড়ছে। আর, হাঁ করা গর্তের ওপর মৃত যোদ্ধার মতো পড়ে আছে বিরাট এক তুঁত গাছ।

"এখন কি করি? হে ভগবান!" কালের মায়ের কণ্ঠে ভয়ার্ত ক্রন্দন।

"তুমি যাও। ছেলেমেয়েদের তোল।" কালের মা ভেতরে চলে যায়। প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে থাকে দেয়ালের পাশে। তাকিয়ে থাকে। বৃষ্টি আর কুয়াশা ভেদ করে মলিন ভোরের আভাস দেখা যায় বুঝি! সকাল হচ্ছে না কি? তাকে আশ্বস্ত করে ঘরের ভেতর বেতের চুপড়িতে ঢাকা বড় মোরগটার পাখা ঝাপটানি শোনা যায়

কোঁকড় কোঁ কোঁ-আ-আ, কোঁকড়-কোঁ-কোঁ-ঙ-ঙ-ঙ! ভোর হয়ে এল!

একটু বেলা হলে পিঠে বিরাট আকারের দুধের ভাণ্ড ঝুলিয়ে বাজারে দুধ



বিলি করতে রওনা হয় কালের মা। কালের বাবা তখন রিমঝিম বৃষ্টিতে গায়ে চটের টুকরো ঝুলিয়ে উঠোনের একদিক কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সমান করছিল। স্ত্রীকে সে ডেকে বলল, "পেরেক লম্বা পেরেক—আনতে কিন্তু ভুলো না। দিনের বেলাতেই চাল মেরামত করে ফেলতে হবে।"

"বৃষ্টি বেশি হলে কালেরা যেন ইস্কুলে না যায়"···বলতে বলতে কালের মা পথে নেমে এল। মাটি পাথর ধ্বসে এক জায়গায় পথও বন্ধ। রোজকার চেনা মুখ কাউকে পথে দেখা গেলনা। কালের মা ধ্বস এড়িয়ে পা বাড়ায়।

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর কাছারির কাছে মোক্তারবাবুর দরজায় এসে পৌছল। এখানে আধ সের দুধ দিতে হবে। দুধ নেওয়ার সময় মোক্তার-বাবুর বৌ তার অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, "ভেতরে এসে বসো না একটু, এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে যাও।" কালের মা ভেজা ছাতা বন্ধ করে দেয়ালের কোণে রেখে ভেতরে ঢোকে।

"কাল রাতে কি ঝড়-বৃষ্টি রে, বাবা!" কালের মা বলে, "আমরা তো সারারাত একটু চোখ বুঁজতেও পারিনি।"

"আমরাও ত।" মোক্তারবাবুর বৌ বলে ওঠে, "সারারাত হাওয়ায় জানালার শব্দ খট্ খট্ খট্ খট্—আমার ঘুমই হয়নি। কি হাওয়া! বাবা রে বাবা!"

"এইটুকুতেই?" চল্লিশ বছরের আঁট-সাঁট বাঁধুনির শরীর দুলিয়ে উপহাসের ভঙ্গীতে কালের মা বলে, "আমাদের বাড়ি ত প্রায় উড়েই গিয়েছিল। এখানে আর কি! আমাদের ত পুরো উঠোনটাই নেমে গেছে। বাড়িটাও যাব যাব করছে। সব সয়ে থাকতে হবে। বৃষ্টি পড়ছে বলে নালিশ করতে পারি না। ঝড় জলে ঘাস কাটতে ছুটতেই হবে, গরুকে উপুসী রাখা যাবে না। রাতে ঘুম হয়নি বলে দিনে ঘুমুতে পারব না!"

"বলতে আমরাই ভাল আছি।" মোক্তারবাবুর বউয়ের কণ্ঠে বুঝি-বা একটু সহানুভূতির সুর, "ছাত চুঁইয়ে জল পড়ে জামা-কাপড়, বই সব ভিজে গেছে। এ বেলা আবার কারেন্ট থাকবে না।·····।"

"সব বুঝলাম। কিন্তু আমাদের তুলনায় তোমাদের কোন বিপদ আপদের বালাই নেই। এই দেখ না, এখানে রয়েছি, আর বৃষ্টিতে বাড়ির কি অবস্থা ভেবে মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমাদের সব ভুট্টার গাছ ঝড়-জলে ভেঙে পড়েছে, একটাও দাঁড়িয়ে নেই।·····"

ওখান থেকে বেরিয়ে অন্য অন্য বাড়িতে রোজের দুধ দিতে পা বাড়ায় কালের মা। হাঁটে আর ভাবে—শুধু শুধু নিজেদের বসত-বাড়ি আর বাস্তু জমির লোভে বিপদ ডেকে এনেছি। শহরের ভিতরে, বাজারে কি সুখেই ছিলাম। মাসের শেষে হাতে নগদ মাইনে। চলেই ত যাচ্ছিল কোনমতে। ছেলেমেয়েদের স্কুল কাছে; জল ভরতে শরীরের কষ্ট নেই, কি সুন্দর সাজানো পথ, ঝড়-জলে ধ্বস নামার ভয় নেই। অনর্থক বসত-বাড়ির মোহে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করলাম……

জমি নিয়ে বাড়ি করার পর থেকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। কতবার কাস্তের আঘাতে আঙুল কেটেছে, গোবর মাটি ছেনে ছেনে হাতের তালুর যা দশা, মানুষকে দেখানো যায় না। শরীর ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে যায় মাঝে মাঝে। বাড়ি একদিনও খালি রাখা যায় না; কোথাও বেড়াতে যাওয়া দুরাশা। এ ভাবেই কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হবে—আমরণ।

এই সামান্য ভাত কাপড়ের জন্যই কি এভাবে মরতে মরতে বাঁচতে হবে? খাই-ই বা কি আর পরি-ই বা কি? যা খাই, তা অন্যের সামনে ধরে দেওয়া যায় না; এই কাপড় পরে অন্যের সামনে দাঁড়াতেও লজ্জা করে।

মনের মধ্যে রাগের দমকা হাওয়া বয়ে নিয়ে কালের মা থানার দারোগার বাড়ি পৌঁছল।

বন্ধ দরজার কাঁচে টোকা মেরে 'দুধ' বলে চেঁচায়। ময়লা জামা পরা একটি মেয়ে এসে দুধ নেয়। রোজের দেড় সের দুধ দিতে না দিতেই ভেতর থেকে দারোগার বউ চেঁচিয়ে বলে, "কাল তিন সের দুধ বেশি দিতে হবে বুড়ি মা, পায়েস বানাব। ভাল দুধ এনো কিন্তু।"

এক মিনিট কি ভেবে মেয়েটাকে দিয়ে বলে পাঠায় কালের মা, "দিতে পারব না, বলে দিও। রোজের দুধ দেওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে! এত ঝড়-বৃষ্টি, কাল আসতে পারব কি পারব না, ঠিক নেই। অন্য কোথাও খুঁজতে বল।"

এ কথা শুনে দারোগা বাবুর বউ দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। কালের মায়ের ভেজা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "তুমি এনে দেবেনা? এই বৃষ্টিতে আবার কোথায় খুঁজব দুধ? তুমিই এনে দাও। দীপকের কাল জন্মদিন……"

"হবেনা", ক্লান্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর যেন তার অন্তর থেকে বেরিয়ে এল।



দারোগাবাবুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, কি পরিষ্কার জামা-কাপড়, কি ফর্সা রঙ, হাতের গড়ন কি সুন্দর! এদের কত সুখ ঘর ভর্তি খাট-পালঙ্ক; আলমারী ভর্তি শাড়ি। মাটি কাদা ছুঁতে হয়না, গোবর ছানতে হয়না, ঝড়-জল থেকে কোন ভয় নেই।

"হবেনা…কাল এরকম হাওয়া বৃষ্টি থাকলে আমি নাও আসতে পারি।"

"আর আমরা সারাদিন বিনা দুধে চা খাব? কি যে বল! এনে দিও এনে দিও, যে ভাবেই হোক, এনে দিও।"

কালের মা আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাজারের দিকে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে রাগে নিজের মনেই বিড় বিড় করে……

"হুঁঃ, এ ভাবে দিনরাত ধ্বস আর ঝড়ের ভয়ে বেঁচে থেকে, দু একর জমির মাটি বছরে দু বার ওলট পালট করে, দু মুঠো কষ্টের অন্নের মুখে ঝাঁটা মারি। সব বেচে দেব—বিয়োনো গাই আর বকনা—যা দাম পাই! খেত জমিও বেচে দেব। বাড়ির টিন কাঠ গোয়ালঘর সব বেচে দেব। পাঁচ-ছ টাকায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে শহরেই থাকব। বাজারে তরি-তরকারীর একটা দোকান দেব—ঠুলির মায়ের মতো। ও ত ছুতোর মিস্ত্রি কি ঘরামির কাজ একটু আধটু জানেই। অন্ততঃ পক্ষে চৌকিদার দারোয়ানের কাজ পেয়েই যাবে। দুটি ত ছেলেমেয়ে, কোনমতে মানুষ করে তুলতে পারবই। ওই শূন্য নিষ্ঠুর জায়গায় আমি আর থাকব না……

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরে তার মন অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। পায়ের ব্যথার কথাও মনে থাকেনা। বৃষ্টিতে ভেজাকেও আর সে আমল দিতে চাইল না। মনের এই ফুরফুরে ভাব নিয়েই সে মাঝগলির মুড়ি-মুড়কির দোকানে গিয়ে পৌঁছল। দু'আনার মটর-ছোলা কিনে থলিতে রাখতে রাখতে এক পরিচিতা ক্রেতাকে কালের মা শুধোয়, "হ্যাঁ বোন, তোমাদের কাছেপিঠে কোন ঘর খালি নেই?"

"কেন দিদি? তোমাদের ওদিকে কি ধ্বস নেমেছে?"

"না, তা নয়, এমনি। আমি শহর-বাজারের মধ্যেই ঘর খুঁজছি। জলের কল, পায়খানা একটু কাছে পিঠেই—এই দশ-পনেরো টাকার মধ্যে। পাওয়া যাবে না?"

"একটা ঘর ত আছে দিদি! লাইটের জন্য আলাদা দু টাকা ছাড়া দশ টাকা ভাড়া দিয়ে একটা বিহারী থাকত। সে ছেড়ে দিয়েছে। আমি কাল তোমাকে খবর দেব, দিদি।"

"আমি নিজেই যাব তোমার কাছে এ রকম সময়ে।" তাকে কথা দিয়ে কালের মা মাঝগলি ছেড়ে মালগোদামের দিকে এগোয়। আরও দু জায়গায় দুধ দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

গুরু বাবুর বারান্দার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে, সেখানে অত সকালেই প্রচুর লোকের ভিড়। কয়েকজন বাইরে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। পাশ কাটিয়ে পেছনের পথ দিয়ে কালের মা অন্য এক বাড়িতে দুধ দিতে ঢুকল। কি হয়েছে বুঝতে পারল না। স্বামী-স্ত্রী, একজনের কিছু একটা হয়েছে হয়ত। ছেলে-মেয়ে নেই, মোটা বউটা দিন-রাত খড়ম পায়ে ঘর-বার করে, একটা সাদা বেড়াল কোলে বাড়ি বাড়ি আড্ডা দিয়ে ফেরে। বুড়োর লেডেন-লা রোডে একটা ড্রাই-ক্লিনিংয়ের দোকান আছে।

"কি হয়েছে, এত লোকের ভিড় কেন?" পাশের বাড়ীতে দুধ নিতে আসা বৌটিকে প্রশ্ন করে।

"গুরুং বাবুর বউ কাল রাত থেকে বেহুঁশ। পড়ে গিয়েছিল।"

কি ভাবে পড়ল জানতে চেয়ে শোনে কাল রাতের প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় সাদা বেড়ালটা কি ভাবে যেন বাইরে রয়ে গিয়েছিল। ডেকেছিল হয়ত, কিন্তু কেউ শোনেনি। বৃষ্টি একটু কমলে বেড়ালের খোঁজ পড়ল। দরজার বাইরে অনেক খুঁজেও, অনেক ডেকেও বেড়ালের সাড়া পাওয়া গেল না। তখন গুরুংবাবুর বউ খড়ম পায়ে বেড়ালের খোঁজে নীচে নামতে থাকে। আর পা পিছলে একদম নীচে গিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এল, তবে একটু দেরীতে। এখনো জ্ঞান ফেরে নি।

"একটা সাধারণ বেড়ালের জন্য এই সর্বনাশ হল! এই ত সেই বেড়ালটা, না?"

একটা শাদা বেড়াল উনুনের কাছে বসে উষ্ণ নিশ্চিন্ততায় থাবা চাটছিল। সেদিকে তাকিয়ে কালের মার কি যেন ভাবান্তর হল—উঠে চলে যেতে পারল না। চৌকাঠের কাছে বসেই রইল—অনেকক্ষণ। বসে থাকতে



থাকতেই দেখল, বুড়ো গুরুংবাবু কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। জানা গেল—বউটা মরেছে।

"কি আশ্চর্য! ধ্যাৎ," নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে কালের মা ওঠে। চৌকিদারের বাড়িতে গিয়ে রোজের এক পো দুধ দেয়। চৌকিদারের ছোট্ট মেয়েটা একটা বাটি হাতে এগিয়ে এলে তার বাটিতেও কয়েক ফোঁটা ফেলে দেয়। তারপর মাটিতে বিছানো চটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে। চৌকিদারনী ফুটন্ত চা নামিয়ে উনুনে দুধ বসিয়ে তাকে শুধোয়, "তোমাদের ওদিকের অবস্থা কি? ঝড় বৃষ্টিতে সব ভেঙে চুরে শেষ করেছে ত!"

কালের মা যেন বুঝেও বুঝল না; নিরুত্তর রইল।

চৌকিদারের বৌ বলতে থাকে, "বাজারের ভেতরে ত আপদ বিপদের কোন ভয় নেই। কিন্তু চা বাগান বা গাঁয়ের দিকে এই দুর্যোগে কি কষ্ট আমার জানা আছে। সে সব ভেবেই ত আমাদের বাবা কাকারা....."

হঠাৎ নিজেদের এক চিলতে জমি এবং ছোট্ট বাড়িটার জন্য মমতায় কালের মার মন ভরে উঠল। চৌকিদারের বৌকে মাঝপথে থামিয়ে সে বলে ওঠে, "বিপদ আপদ কোথায় বা নেই, বল! ঝড়ে হয়ত কিছুটা ক্ষতি করেছে, সব আবার ঠিক করে নেব। সেটুকু মুরোদ কি নেই? নিজেদের বাড়ি রয়েছে, গোয়াল-ঘর রয়েছে, গরু আছে, জমি আছে, জমিতে ত্রিশ চল্লিশ ঝাড় বাঁশ আছে, চাঁপা এবং ডুমুরের গাছও আছে; শশার লতা লকলকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। ঝড়ে বৃষ্টিতে কতটা নষ্ট করতে পারে?....."

"আচ্ছা! এখন উঠি; গিয়ে সব ঠিক-ঠাক করতে হবে।"

জিভ-পোড়ানো চা কয়েক ঢোঁকে গিলে কালের মা তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে ছোটে পেরেক কিনতে। আর নিজের মনে বলতে থাকে—ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে। বুড়ো মিন্সে আজ ঠ্যাঙাবে আমাকে।

## হাতের তাস মেলে ॥ বরুণ চৌধুরী

আমি এখন আমার হাতের তাস
অবসন্ন সৈনিকের শরীরের মতো
মেলে দিয়েছি
সবুজ ঘাসের অঢেল উরুদেশে
উজ্জ্বল মদের সঙ্গে একটা রক্তাভ চেরীর মতো
সূর্য দ্রুত নেমে যাচ্ছে
আমার কণ্ঠনালী বেয়ে
পাতায় পাতায়
কোনো ঘোর ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফাস
একটা বিস্বাদ রাত্রি মুখে পুরে
কাল সারারাত ঘুম আসেনি আমার
আমি কুলকুচো ক'রে
উগরে দিতে চেয়েছি
আমার ভেতরের তিক্ত অন্ধকার
আমি অঞ্জনার বুকের আঁচল খসিয়ে
চীৎকার করে বলতে চেয়েছি
তোমার বুকের আধ-খাওয়া পাউরুটিতে
আজ শুধু নীল ফাংগাস
এখনও তুমি একটা
'নেকড়ে ডাকতে পারলে না হানি··· ?'

প্রতিটি নারীর মুখের মলাটে
যৌনতার জলন্ত লাল পাইকায়
দেহের গোপনতম স্বাদ লেখা থাকে
আমি সব পড়ে নিতে পারি
অন্ধকারে অথবা রোদ্দুরে
আমার থেকে মিথ্যে তাই
মাত্র দু-মিটার দূরে



অথবা সত্য নামক মৃত্যু থেকে
আমার ব্যবধান কেবল উনষাট সেকেণ্ড
পাশেই শুয়ে থাকা একটা শান্তিকামী মাতাল
শুকনো পাতার কম্বলে সেঁদিয়ে
শীত রুখতে চায়
পাতার আগুন জেলে
সে দুরন্ত শীতের প্রতিবাদ করেনি
অথচ আমি আজীবন প্রতিবাদে
মাটিতে পা ঠুকেছি
বুকে তারা-নেভা অবসন্নতা নিয়ে জেনেছি
আমি পদে পদে
সেই মাটিকে অপমান করি
যে মাটি আমায় হাঁটতে শিখিয়েছে।

## এভাবেই যেতে হয় ॥ দেবাশিস বসু

প্রেমে ও অপ্রেমে তুমি সেরকমই শান্ত অবিচল
যখন গাছের পাতা খসে পড়ে হিমেল ছোঁয়ায়
মৌসুমী ফুল ফোটে, অজানা সুদূর থেকে পাখি
ঝাঁক বেঁধে উড়ে এসে বসন্তের আগমনী গায়
তুমি সব ভুলে গিয়ে ঐ চোখে স্থির চেয়ে থাকো,
সে কি প্রেমে ?—একা একা এই দৃশ্য দূর থেকে দেখা
অসীম ধৈর্যের, তবু এভাবেই চেয়ে দেখতে হয় ;
অথচ ভিতর পোড়ে···অন্যমনে তোমাকে সাজাই
রক্তের গভীর থেকে তুলে আনা নিপুণ অক্ষরে

এভাবে তোমার কাছে যেতে হয় কবিতায়
শুধু এইভাবে যাওয়া চলে।

## এই ভয় ॥ সাধনা মুখোপাধ্যায়

সারাটা জীবন
কোলের ছেলের মতো
এই ভয় বয়ে বেড়ালাম
যমজ আত্মার মতো
এ ভয়ের অবস্থিতি
বার বার নীরবে সেলাম
ঘুষ দিয়ে গেছি
করেছি যে অজস্র প্রণতি
কখনও হয়েছি নম্র
কখনও হলাম রূঢ়মতি
এই ভয়
সাপের মতোই তবু
জড়িয়ে রয়েছে যেন সমস্ত হৃদয়
যেন এক হৃৎপিণ্ডের
ধুক্ ধুক্ ধ্বনি
অন্তর্নিহিত এক ফল্গু নদী
একটু সুযোগ পেলে
ভাসিয়ে বিশাল এক বিপুল প্লাবনে
করে দেয় ধুলায় শায়িত
এই ভয়
সমস্ত সঙ্কল্পে আনে
ইতস্তত দারুণ সংশয়
বার বার করে অর্ধমৃত
এই ভয়
সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ছায়ার মতোই
হয় আরও দীর্ঘতর যতই
আলোর আমি সামীপ্যে এগোই



এই ভয়
যমজ আত্মার মতো
ঘনিষ্ঠ একক সহবাসে
আমার জীবনে আনে
প্রত্যহ মেঘের সমারোহ
বারবার মুক্তি পেতে চাই আমি
কুটিল দাসত্ব থেকে তার
শ্বাস নিতে চাই আমি
সোনালী আকাশে
এই ভয়
এ ভয়েরই পা বন্দীত্ব
আমাকে দেয় না করতে
সচিৎকারে মহাবিদ্রোহ

## ঘাতকের উদ্দেশ্যে আমি ॥ পীযূষ রাউত

বস্তুত নিথর স্বপ্নে
আমার আজন্ম শত্রু আমূল বিঁধিয়ে দেয় পাঁজরের নীচে
বারো-ইঞ্চি ছোরা।

ঘাতক, সেপটেমবরে তুমি
আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছ পঁচিশ টাকা।
ভালো। খুব ভালো কথা।
পচনশীল দ্রব্য। যেমন,—মাছ মাংস সব্জি;
অনুরূপ ছাখো, এই আমি, বয়স চল্লিশ,
ক্রমশ জরার দিকে……
মৃত্যুর দিকে…।
আতরের গন্ধে গলিত শবদেহের বিচ্ছুরিত ঘ্রাণ
ঢাকা কি পড়ে?
যে মরণোন্মুখ লোকটার লিউকোমিয়া,
স্বর্গত বিধানবাবুর চিকিৎসা তাকে দিতে পারে

অতিরিক্ত বারো বছরের সুস্থ জীবন ?
সেই আমারই হঠাৎ দীক্ষা হয়ে গেল।
জনৈক মহাপুরুষ দীক্ষা দিলেন নির্জীবতার
অমূল্য মন্ত্র।
তার কণ্ঠ-নিঃসৃত গম্ গম্ শব্দে
আমি পলকেই ভুলে গেলাম বিবাহ-বার্ষিকীর তারিখ,
প্রিয় সন্তানের জন্মদিন।
আমার মহিলাসুলভ কৌতূহল নেই যে,
বলতে যাবো, ইস্কাপনের বিবি, তুমি কার হাতে ?
সুনির্মল না সূর্যের ?
স্বয়ংক্রিয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র আমার বুকের ভিতর।
অনবরত সে সোচ্চার হচ্ছে,—তুমি মার খাবে,
প্রচণ্ড মার খাবে।
তবু আমার শরীর আহত বাঘের মতো দুমড়ে উঠবে না।
জমে উঠবে না ডান-বাম কোনো চোখেই
এক বিন্দু জল।
ঘাতক, একবার অন্তত স্মরণ করো, সেপটেমবরে তুমি
আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছ পঁচিশ টাকা।

## গ্রেভ ইয়ার্ড ॥ অজিত বাইরী

গ্রেভ ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই—
অসংখ্য স্মৃতি-ফলক
হাজার নক্ষত্রের নিচে জেগে আছে।
এখানেই
পাশাপাশি শুয়ে আছে শয়তান ও ঈশ্বর।
আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়ঃ
এখানে আসতে হলে, এই নীল নির্জন
ঘুমের স্বর্গে
আমি কোন্ রাস্তা ভেঙে এখানে আসবো !



## সরীসৃপ ॥ কালীকুমার চক্রবর্তী

বেলা অব্দি খাল-পাড়ে পড়ে থাকে লাশটা। হা-মুখ, চোখের গুলি বের করা। গাল-চোয়ালের হাড় মাংস খেত্‌লে দেওয়া হয়েছে। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে কাল্‌চে রক্ত। রক্তভেজা মাটিতে বড় বড় পিঁপড়ে, ঘুরছে এদিক সেদিক। সাংঘাতিক দেখাচ্ছে লাশটাকে, বীভৎস। পাশে ন্যাংটা বাবলা। তার মাথায় কয়েকটা সেয়ানা কাক ডালে ডালে লাফালাফি করছে। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে চিল। সামনে হেজে-থাকা খাল, পেছনে ফাঁকা রেলওয়ে ইয়ার্ড। ফাঁকা বলেই জায়গাটা থমথমে। লোক চলাচল কম। চাদ্দিকে খবর রটার আগেই সূর্য মাথা বরাবর উঠে আসে। চোত্ শেষের রোদে ধূ ধূ লাগে। ঝিম ধরে থাকে চারপাশের শূন্যতায়।

কেউ ভয়ে ভয়ে ভীরু পায়ে' কেউ বা সাহস দেখিয়ে ছুটে মুটে খাল পাড় ধরে এগোতে থাকে। সান্‌টিং খাওয়া মালগাড়ীর মত লোকের সারি এগোয় পেছোয়। যেতে যেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হঠাৎ পড়তে পড়তে আধবয়সী লোকটা ঝুঁকে দাঁড়ায়। চোখ কুঁচকে বলে—সুইসাইড্ কেস মনে হচ্ছে। বেশী বয়সী লোকটা কপালের ভাঁজে টান রাখে। স্থির গলায় উত্তর দ্যায়—মার্ডার মশাই, নির্ভেজাল খুন। বাঁ হাতের দু' আঙ্গুল নাকের চুল টানতে টানতে কেষ্ট নামের না-কিশোর না-যুবকটা ভুরু কোঁচকায়—লোকটাকে তো চেনাই যাচ্ছে না। হঠাৎ পায়ে ব্যালান্স রেখে বিন্টু পিছ্‌লে গিয়ে নীচে নামে। এ-পাশ ও-পাশ লাশটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে এবং আচমকা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে—গবা রে, আমাদের গবা। সঙ্গে সঙ্গে এ ওর গায়ে, ও এর গায়ে ধাক্কা খায়। সামলে সুমলে কেষ্ট শেফালি নামের ডিমালো মেয়েটার মুখে চোখ রাখে। মেয়েটার ঠোঁট কাঁপে, রুদ্ধশ্বাসে কিছু বলতে চায়, পারে না, নীচু মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেষ্ট কাশতে গিয়ে ঠোঁট থেকে বিড়ি পড়ে যায়। জম-জমাট জটলায় ভোজবাজির মত চিড় ধরে যায়। কারো মুখে রাগ, কারো স্বরে শোক, কারো কারো গলায় ক্ষোভ বা প্রতিহিংসার আগুন গন-গন করে। এইভাবে সমস্ত পরিবেশে আতঙ্ক নামে। গা-ছমছমে হাওয়া বইতে থাকে। বিন্টু কোমর বেঁকিয়ে তেরচা তাকায়—তপাদের খবর দে কেষ্ট। তার চোখে মুখে রি রি

রাগ। গবার লাশে রোদ ঠিক্‌রে পিছলে যায়। মুখ-চোখ-কানে হু হু বাতাস ঢোকে, বেরোয়। খবর শুনে লোক আসে, ছাখে, যে যার নিরাপদ সীমায় চলে যায়।

তপা বাঁশ দোফালা করে চাঁছে। রাগে হাত কাঁপে। শরীরে উত্তেজনা বাড়ে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে সুনীলদার দিকে রুখ্‌কু তাকায়,—এর বদলা চাই সুহৃদা, বাইঞ্চৎরা সাপের লেজ দিয়ে কান খোঁচাচ্ছে, সমঝে দেয়া দরকার। বিন্টু তার কথার গোড়া ধরে বলে—কুত্তার বাচ্চারা কোন্ মা'র দুধ খেয়েছে দেখা যাবে। সুনীলদা কথা বলে না। ঠোঁট নড়ে। করুণ চোখে মুখে গবার লাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আচমকা তপার বুড়ো আঙ্গুলে বাঁশের হুল ফুটে যায়। আঙ্গুল কামড়ে ধরে সে ঠোঁট বেঁকায়—পকা শোরের বাচ্চাদের কাজ এটা। কেষ্ট কাতার দড়িতে গিঁট দিতে গিয়ে থামে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে—অনেক সহ্য করেছি, এবার ও শালাদের একটাকে হাফিজ করবো। সুনীলদা তবু মুখ খোলে না। নাক উঁচিয়ে বাতাস ন্যায়, ছাড়ে। ধর্মগুরুর মত নিদারুণ নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। শেফালি নামের ডিমালো মেয়েটা বারে বারে গবার লাশে চোখ রাখে। কি যেন ভাবে, কিংবা ভাবে না। কেষ্ট ঠারে ঠোরে তার দিকে তাকায়। ঠিক এইসময় পুলিশ ভ্যান থেকে দু'জন অফিসার নামে। সুনীলদাকে নমস্কার জানায়। সুনীলদা চোখ-মুখ ফুলিয়ে কি সব বলে। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে ওরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। গবার লাশকে ঘিরে এখন নানা লোকের ভীড়। নানা জনের টুক্‌রো-টাক্‌রা কথা চলে। নিজেরা নিজেরা প্রশ্ন এনে উত্তর খুঁজে ন্যায়ঃ—চেনেন না? গোবিন্দ সমাদ্দার, নাম আছে, সোশ্যাল ওয়ার্কার / বাড়ী কোথায় বলুন তো? / সুহৃদার বাগান বাড়ীতে থাকতো / পার্টির লোক নাকি? / পার্টি কি মশাই, কাজকম্ম করতো আর কি / ছেলেটা উপকারী ছিল / আমাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল / আমার মেয়েকে চাকরী দেবে বলে কথা দিয়েছিল / মারলো কারা বলুন তো? / কেউ বলছে নিজেদের লোক / ওরা তো বলছে এ্যান্টি পার্টি।

খাটের ঢঙে তৈরী মাচায় গবার লাশটাকে শোয়ানো হল। তার বুকে গোলাপ, মাথার কাছে রজনীগন্ধা ও পায়ের দিকে চন্দ্রমল্লিকা সাজিয়ে



দেওয়া হল। ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে পরিবেশে শুচিতা আনলো। এইবার পায়ে পায়ে সুনীলদা এগিয়ে এল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গবার লাশকে অভিবাদন জানাল। তার স্বাভাবিক শান্ত অথচ তেজালো স্বরে বলল—ভাইসব! এখন বক্তৃতা নয়, শোকের সময়। যারা আমাদের গোবিন্দকে খুন করেছে ইচ্ছে করলে আমরা তাদের ছারপোকার মত টিপে মারতে পারি, কিন্তু আমাদের আদর্শ তা নয়। আমরা আরো রক্ত দিতে প্রস্তুত, তবু আদর্শ বিসর্জন দেব না। সুনীলদার মুখ লালচে দেখাল। ছোট ছোট চোখ দু'টোতে যেন আগুন জলে উঠল। একনাগাড়ে বলে সুনীলদা দু' পা পিছিয়ে এল। ইঙ্গিতে ওদের বাঁশের মাচা তুলতে বললো, এবং আগে আগে হাঁটতে থাকলো। সুনীলদাকে এখন যেন যুদ্ধের অহংকারী সেনাপতির মত দেখাতে লাগলো। গবার লাশ কাঁধে মাঝখানে তপা-কেষ্ট-বিন্টুরা। পেছনে মুঠো মুঠো খই ছড়াতে থাকলো নীলু ঘরামি। সঙ্গে সঙ্গে চেনা-জানা অনেক লোক। তার পেছনে পুলিশ ভ্যান। গোবিন্দ সমাদ্দার ওরফে গবার লাশটা এই ভাবে গণ্যমান্য হয়ে উঠল। শ্লোগান, হরি-ধ্বনি, চীৎকার চেঁচামেচির মধ্যে মিছিল এগোতে লাগলো। কেষ্টর স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিলো, বিন্টুর পা টলমলো, তপা আলফাল বকে চললো। কারো চোখে জল এসে যাচ্ছিলো। কারো বুক মোচড় খেয়ে উঠলো। অনেকে বললো গবা ছেলেটা উপকারী ছিলো। শেফালি সব শুনতে শুনতে চললো। তাকে চলতে হলো গবার মুখে আগুন দিতে। হঠাৎ তার চোখের সামনে গবা যেন উপাস্য ঈশ্বর বনে গেলো। লোকের ধাক্কায় পড়ো পড়ো এক ছানি-চোখো বুড়ি ধরা গলায় ককিয়ে উঠলো—কে মারা গেল গো বাবু? ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল—সরে যাও, সরে যাও বুড়ি, গবাদা খুন হয়েছে। —খুন হয়েছে? কি বললে গো, গবা খুন হয়েছে? হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো বুড়ি। কাঁদতে কাঁদতে মিছিলের পিছু পিছু চললো। শেফালি সরে এসে জিজ্ঞেস করলো—চিনতে নাকি মাসী? —চিনতাম গো, হাড়ে হাড়ে চিনতাম, ও ই তো আমার নশুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছিল, ফেরেনি আমার নশু। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বুড়ি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শেফালি। সে এই প্রথমই যেন একজনকে পেল যে শয়তানকে ঈশ্বর বানায়নি। অথচ সে নিজে কিছুতেই বলতে পারলো না—এই গবা গুণ্ডা আমারো সর্বনাশ করেছে গো, আমারো সর্বনাশ করেছে। শুধুমাত্র মিছিলটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকলো। একটা বিষধর সাপ যেন এঁকে বেঁকে আক্রোশে ছুটে চলেছে। পেছনে ফেলে যাচ্ছে দু' দলা তাজা বিষ।

## প্রথমপুরুষ ॥ তপোধীর ভট্টাচার্য

তার মুখে ছিল অবিকল দুঃখী মানুষের প্রতিচ্ছবি
সে গান গায় একা-একা
ঠিক দুঃখী মানুষের মত
সে হাঁটু মুড়ে কাঁদে!
তার দু'পাশে স্থির হয়ে থাকে সূর্যাস্তের নদীতীর
আর হিমেল সন্ধ্যায় চোখের কোটরে
গুঁড়ি মেরে উঠে আসে
অন্ধকারের মত অন্ধকার!
তার কণ্ঠস্বর খুব মৃদু, নির্জন পাখির মত,
সে তোরঙ্গ থেকে খুলে আনে অব্যবহৃত
পুরোনো পোষাক, গুণে নেয়
খুচরো পয়সা, সিকি ও আধুলি!
সে একলা জেগে থাকে ভোর-রাতে, নিতান্ত
ব্যর্থ মানুষের মত তার ঘাম
ঝরে পড়ে ঘাসের শিশিরে, সাড়ে
তিন হাত দুঃখ নিয়ে সে চুপচাপ বসে থাকে!
তার মুখে ছিল অবিকল দুঃখী মানুষের প্রতিচ্ছবি
সে একা-একা গান গায়
ঠিক দুঃখী মানুষের মত
সে হাঁটু মুড়ে কাঁদে!

## চিহ্নিত সময়ে ॥ দেবপ্রসাদ মিত্র

কখন আসবে যে ঠিক ক্যানিং লোকাল
আমি বলতে পারিনি, কোন একদিন
উদ্বিগ্ন গ্রামের একজন মানুষকে।

—আর কতদিন এই অপেক্ষার কাল?
চোখে তার প্রশ্ন রেখেছিল—সেই একজন।



আমি বলতে পারিনি শেষ কবে হবে
তার প্রতীক্ষার দিন। সহজ উত্তর
থেকে গেছে চিরদিন আমার অজ্ঞাতে।

টাইম টেবিল দেখে, তবু কেউ বলে দেয়
নির্ভুল সময়। আর কিছু ভাগ্যবান
জানে সব জিজ্ঞাসার সুস্মিত উত্তর
তারপর একদিন স্টেশনে পৌঁছয়
ঈপ্সিত ক্যানিং লোকাল। প্রতীক্ষার শেষে
নহবতে বেজে ওঠে বাগেশ্রী, বেহাগ।
বাড়ীঘর খুঁজে পায় উদ্বিগ্ন মানুষ।

শুধু এক চিহ্নিত সময়ের জন্যই
আমি থাকি মঞ্চ জুড়ে নায়কের মত
যখন জানতে চায় কেউ ট্রেণের সময়
এবং খোঁজে একজন তার অপেক্ষার শেষ।

## ভালবাসা ॥ সুরথ বিশ্বাস

বাস্তবে স্বার্থের মাঠে হল চেনা-জানা
সময় গিয়েছে ভুলে কোন লগ্নে যাত্রা হল শুরু
প্রকাশ পেয়েও সে তো আসেনি গোচর

ঘাত প্রতিঘাত এল, এল কশাঘাত
সম্বিত ফিরিয়ে দিল
প্রকাশ পেলো সে এসেছে, এসেছে অনেকদিন

অন্তরালে, অগোচরে সময়ের সস্নেহ উত্তাপে
হোয়েছে বর্ধিত।
বাস্তবের স্বার্থ দিয়ে শুরু
নিঃস্বার্থে উজাড় হওয়া পরিণতি তার

## বৃষ্টি ॥ জয়ন্ত মহাপাত্র

অনু : সরিৎ তোকদার

১. এ কোন খেলা কার আবিষ্কার
যদি আমি অন্তহীন মরুভূমির শেষ জানতাম।
২. পরিষ্কার, জ্ঞানী চোখ জলের, চলমান।
জীবনের পরপারে দৃষ্টিপাত।
কেমন করে অথবা কোথায় আমি চাইনা,
অথবা এই পৃথিবী— শুধুমাত্র একটি সাক্ষী
দেহ এখনও উষ্ণ— হাত দিলে অনুভব।
৩. দেওয়ালের অপর পারে আমি দেখি
মানুষের উপর ক্রীড়ারত— স্তব্ধতা স্তূপীকৃত
অন্তহীন বিশালতা অনুভব করা যায়
ধীরে ধীরে দোর খোলে
যদি আমি বড় হই— পৃথিবী অথবা পাথরের মতো
কান্না জড়ানো বিমর্ষ শব্দ শুনতে পাব না।
৪. যদি এটা খেলা হয়
শিশুকালে কবে খেলেছিলো
কোন শব্দেই তা' ঢাকা যাবে না।

## বেশি করে ঘাস খাও ॥ জো কোর্‌রি

অনু : সরিৎ তোকদার

আরো বেশি ফল খাও! ওরা শ্লোগান দেয়
আরো মাছ, মাংস এবং রুটী!
আমি যে বেকার-ভাতায় আছি
তিন বছর চলছে, এবং বিবাহিত।
এই ভাবে চলবে— একদিন আশ্চর্য হয়ে শুনব
আমার জন্য শ্লোগান
বেশি করে ঘাস খাও, রক্তাক্ত ঘাস।



## ফসলের মাঠে এলে ॥ অরুণাভ ভৌমিক

ফসলের মাঠে এলে অসহ্য কান্নার মত মা-র মুখ
চোখে ভাসে
এখানে উধাও মাঠে
বাতাসে গাছেতে কতো ঘনিষ্ঠ মধুর
সোনালী ধানের মাঠ
শীর্ষচূড়ে মায়ের মুখের মত ফল
ভালবাসা ছড়িয়ে যায়

গ্রাম ক্ষেত প্রত্যেক পাখীর রব
মিষ্টিমণি ঘাসে
শিশির ভেজানো রৌদ্ররেখা ছুঁয়ে
আশ্চর্য নম্রতা ক্রমশই ফুটে ওঠে
মাটির স্বেদে স্ফুরিত ভালবাসা
কৃষকের চোখের দর্পণে
সময় হ'য়ে গেলে
তুলে নেবে বর্ণময় সম্ভার···

ফসলের মাঠে এলে অসহ্য
কান্নার মত মা-র মুখ···

## গ্রীষ্ম অবকাশ ॥ প্রণব মাইতি

হেলা-ফেলা করে গেল গ্রীষ্মের একষট্টি দিন
না পাহাড়, না সমুদ্র বেরুনো হ'লো না
প্রতিশ্রুতি জমা ছিল শিলং বা দার্জিলিং
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক

তুমি বলো বদলেছি—আগের মতোন নেই
ঘাম মোছ লোড্‌শেড্‌ সঙ্গসুখ দাও

হাজার হাজার কথা ডুবে যায় গ্রীষ্মদিনে
অসময়ে জানোই তো—একটা নোটের কত দাম

অকালমৌসুমী এসে পাখির মিছিল ভাঙ্গে
অসময়ে আড্ডা ভাঙ্গি তোমারই সুবাদে
হা-ঘরের মতো হাত পেতেছি তোমার দিকে
ছুটির বিকেলে রাত বানাতেই হ'ল

অবকাশ ফুরোতেই নিরন্ধ্র কাজের দিন
কলঘরে অভিমানে জলপ্রপাতের আয়োজন।

## জেগে আছি ॥ দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আলোর ভিতরে আলো, হাওয়ার ভিতরে হাওয়া হয়ে
জেগে আছি, উড়ে যাচ্ছে চারিপাশ হতে
সব সুখী জিনিষেরা, বদলে অনুশোচনা
বড় বেশী কাছাকাছি, যেন
স্থিতময় গায়ত্রী এবার ভুলে হব
অপার চঞ্চল

এ-সময়ে কারুর কথাই মনে পড়ে না, কেবলই
ঘুরে যায় সেদিনটির প্রদর্শনী, চলে অবিরল।
সেদিনের বাণীময় চত্বরে গানের
প্রিয় পাখী, প্রিয় ধ্বনি নিয়ে
শোভন বাঁশির সুর, তবু হায়……, তাই
আজ তো অপেক্ষমান,
আলোর ভিতরে আলো, হাওয়ার ভিতরে হাওয়া।

## শিল্পমন্দির ॥ কমল তরফদার

তোমরা বানিয়েছিলে শিল্পমন্দির
চুম্বক বসিয়েছিলে সারা দেহে



চুম্বক টেনে আনতো ঢেউ
রাশি রাশি শিশুদের হাত, পাখিদের ডানা
চুম্বক তোমাদের বেঁধেছিল উৎসবের ঘরে

সেই আকর্ষণে নটীর এলো পা
তার পায়ে সম্মোহন
সেই আকর্ষণে সরীসৃপ এলো পাথরে
তার কোনো মোহন মূর্তি নেই
জিভে শুধু জ্বালা
সেই আকর্ষণে কাছে এলো সময়
তাই সূচিকা দন্তে স্বাভাবিক রূঢ়তায়
তোমাদের হাতগুলি হয়ে যায় নীল
বন্ধু, সহযাত্রি, প্রিয়,
তোমরা লীন ঘন মরণে

## প্রতিবেশী দুটি কবিতা / ভাষান্তর ঃ উজ্জ্বল সিংহ

গুজরাটি কবিতা / হেসেছিলাম ॥ লাভশংকর ঠাকুর

আমার মৌন সময় বয়ে নিয়ে যায়
দাঁতে দাঁত ঘসে ঐ সমুদ্র
হাওয়ার উপরে যেন সে শিথিল সওয়ার
যেন আহত পাখীর মতো বেদনার্দ্র।

তার কিছু আগে ময়ূরের মতো পাখার অহংকারে
উদাসীন প্রকৃতি কাঁপিয়ে হেসেছিলাম গভীর ঝংকারে॥

হিন্দী কবিতা / ফুল ॥ বলরাজ হায়রত্

তোমার জন্যে এনেছিলাম একটি ফোটা ফুল
তার পাপড়ি ভরে খেলা করে তোমারই যৌবন
সে ফুল হঠাৎ ফেলেই দিলাম সে কি মনের ভুল

ভেবেছিলাম তোমার কানে কাল সকালে সে যদি ছায় বলে
আমার প্রাণের গভীর গোপন
হয়তো তুমি ভুল বুঝে হায় যাবেই চলে ছড়িয়ে এলোচুল

## প্রেম, অন্য রকম ॥ জেনেথ নিকলস্

অনু : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সে চাইতো হাত বুলোতে
পোয়াতিদের পেটে
আর বলতে,—সাবাস সাবাস।
ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে
পকেটে হাত, মাথা নীচু
চট-জল্‌দি ভালবাসার মুহূর্তে
সে তাদের ভালবাসতো।
প্রত্যেককে ফিস্‌-ফিসিয়ে বলতে চাইতো
যেন পিতা অথবা প্রেমিক,
—লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে!

## বয়স ॥ কবিরুল ইসলাম

হায়, তোমারও বয়স বাড়ে!
রোজ সাইরেনে, অভ্যাসে সকাল নটা বেজে ওঠে : হায়,
তোমারও বয়স বাড়ে!
আয়নার পারদ ক্রমশই উঠে-উঠে যায়
তুমি তো আমার আয়না ছিলে।
হাতের চিরুনি তাই অপ্রস্তুত খসে পড়ে
এবং সিঁথির দু'পাড়ে পড়ন্ত রোদ ঝিকমিক ক'রে জমে, হাসে :
যে ঘরে সংসার বহু মানে যত্নে ঘামে একদা সাজানো ছিলো
ছাখো, দেয়ালে প্লাস্টার
যেন বা তোমার প্রসাধন

হায়, নষ্ট হয়ে আসে !!



## রাজাকর ॥ সুভাষচন্দ্র গুহ

জীপ গাড়ির ভেতর আমরা চারজন। কর্ণেল সাহা, আমি, মোতায়ের হোসেন ও তাঁর বেগম। গল্প করতে করতেই আমরা ছুটে চলেছি। কর্ণেল সাহা যুদ্ধের একাধিক ঘটনা, মিলিটারী আইন কানুন এসব বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হবার পর হোসেন সাহেব পরিবার নিয়ে দেশে ফিরছেন—এই প্রথম। তার চোখেমুখে এখন নিরবচ্ছিন্ন সোয়াস্তি আর আত্মনির্ভরতার ছাপ। দেশে কে কেমন আছেন, জমি জমা সম্পত্তির কি অবস্থা—এসব কথা বলছিলেন মাঝে মাঝে। বেগম হোসেন বলছিলেন এদেশ নাকি তার খুব ভাল লেগেছে। কলকাতার মত শহর পৃথিবীতে আর নেই। কলকাতা ছেড়ে যেতে হচ্ছে তার কাছে এটা বিরাট ট্র্যাজেডী।

কথা বলতে বলতে আমরা নানারকম মন্তব্য করছিলাম, উত্তেজিত হচ্ছিলাম। একসময় বেগম আমাকে বললেন, বাইরের দিকটায় অমনভাবে কি দেখছেন?

বেগম আমাকে লক্ষ্য রাখছেন, এটা আমার ভাল লাগল খুব। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বলুন তো কি দেখছি? বেগম বল্লেন, আপনি তো সোনার বাংলার লোক—

—তা বলতে পারেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ কথাটার মধ্যে যতটা আনন্দ পাই বাংলা দেশ কথাটায় তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ পাই। কিছুক্ষণ বাদেই বাংলা দেশ দেখবো, সোনার বাংলা, সেকথাই ভাবছিলাম!

—কেন এর আগে কি সোনার বাংলা দেখেননি?

—ঠিক দেখিনি বল্লে ভুল হবে। দেখেছি, বুঝতে পারি নি।

বিরাট শব্দ করে হেসে উঠলেন সবাই! কথাটা একটু অদ্ভুত ধরণের হয়েছিল বোধ'য়। আমি শুধরে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, মানে তিন বছর বয়সে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসি। সেটা ১৯৪৮ সাল।

হোসেন সাহেব হাসি থামিয়ে কথা পাড়লেন, ইজ ইট? তাহলে তো একটা গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার আপনার কাছে বলুন। বল্লাম, হ্যাঁ এ্যাডভেঞ্চার, অল্‌সো এ রেড লেটার ডে।

হোসেন সাহেব এবার সাহার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, কর্ণেল, আমরা কি

সীমান্তের কাছাকাছি এসে গেছি ?

কর্ণেল একটু ভেবে নিলেন। বল্লেন, প্রায় এসে গেছি, আর ক্রোশ তিন।

চোখ বুজে আরেকবার ভেবে নিলাম সীমান্তের ওপারটাকে। সোনার বাংলাকে !

দু'ধারে ফাঁকা জমি। মাঝখান দিয়ে মাইলের পর মাইল লম্বা পীচের সড়ক। আমাদের জীপ পাকা সড়কের উপর দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত, জলা-জঙ্গল, দূরে দু একটা গ্রাম-রেখা ; পাহাড়ের মতো গাছের সারি।

ঝোড়ো বাতাস জীপ গাড়ীর ভেতর আমাদের কথাগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল সময় সময়।

এ্যাডভেঞ্চার শুধু আমার একার নয়। মোতায়ের হোসেন বেগমও এ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করছেন সমানে। শুধু কর্ণেল সাহা-ই কাণ্ডারী হয়ে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, শিখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ থেমে গেলেও নাকি বিপদের ঝুঁকি আছে, বলছিলেন কর্ণেল সাহা।

বিপদের কথা উঠতেই নিজের কথা ভাবলাম। ভিসা পাসপোর্ট কিছুই নেই নিজের কাছে। তবু ওদের সঙ্গে সীমান্ত-টা পেরিয়ে যাবো।

এই তো সুযোগ। জীবনে এরকম সুযোগ কমই আসে। বেগম হোসেন বলছিলেন, কর্ণেল সাহা রয়েছেন, মিলিটারী ম্যান—ঝুঁকি পোহাবার লোক তিনিই।

আমি বল্লাম, মিলিটারী ম্যান মিলিটারীকে দেখবে ; সিভিলিয়ানদের দেখবে কেন ?

বেগম বল্লেন, তাহলে তারা যুদ্ধ করছে কেন ; দেশের মানুষের জন্য নয় কি ? সিভিলিয়ানদের রক্ষা করাই তাদের কাজ !

বেগম কথায় পটু। পরিষ্কার সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে জানেন। ভালোও বাসেন বলতে।

আমি চুপ করে গেলাম। আসলে প্রশ্ন করতেই ভাল লাগছিল আমার। আমার প্রতি বেগমের কমবেশী স্পর্শকাতরতায় আমার নজর ছিল।

একবার বল্লেন, আপনি কিন্তু আমাদের ওখানে যাবেন।

আমি বল্লাম, কি ক'রে ? রাস্তায় ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, মিলিটারী টহল, এ অবস্থায়—



—কে বল্লো আপনাকে ? এখন সব ঠিক হয়ে গ্যাছে। কাগজেই তো দেখলাম।

—কাগজ ? তুমি কাগজের সব কথা বিশ্বাস করো ?—বল্লেন মোতায়ের হোসেন।

—অবস্থা স্বাভাবিক হ'তে এখনও ছ' মাস। আমাদের সোলজার এখনও ওপারে—। শুধরে দিলেন কর্ণেল সাহা।

—তাই নাকি ? ইণ্ডিয়ান সোলজারস্ ! বেগম আশ্চর্য হ'লেন অদ্ভুত ভাবে।

হোসেন সাহেব কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

—কেন ? আশ্চর্য হ'বার কি আছে ? হাসতে হাসতে বল্লেন কর্ণেল সাহা। বলতে গেলে স্বাধীনতা তো আমরাই দিয়েছি।

এমন কথা কর্ণেল বলতে পারেন আমি ভাবতেই পারিনি। কথাটায় যে সামান্য খোঁচা দেওয়া হ'ল এটা বোধ'য় তিনি ভাবেননি। দুই বাংলা-দেশী-র মনে কি এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা-ও তিনি তলিয়ে দেখেননি নিশ্চয়ই।

আমি ওদের দুজনের দিকে তাকালাম—যদি কিছু ঘটে যায় এইভাবে।

অবশ্য তা হ'ল না। বেগম ও মোতায়ের হোসেন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলেন। কর্ণেলও যোগ দিলেন সেই হাসিতে। তিনজনের উচ্চ হাস্য আমার কানে বাজতে লাগল। আশ্চর্য ! হোসেন সাহেব কিন্তু সে হাসি সহজে থামাতে চাইলেন না।

মনে হ'ল হোসেন সাহেব কথাটাকে ফালতু ও খেলো করে ধুয়ে মুছে দিচ্ছেন তার হাসি দিয়ে।

বুদ্ধিটুকু নিখুঁত। কর্ণেল অবশ্য কোন কিছুই খেয়াল করলেন না।

গাড়ি এতো জোরে ছুটছিল যে সিগারেট ধরাবার ফুরসত নেই। সিগারেট আমি খুব খাই না ; কিন্তু একা থাকলে বা দশজনের মাঝে হঠাৎ কথা ফুরিয়ে গেলে সিগারেটটাই তখন অবলম্বন।

কিন্তু এ যাত্রা বোধ'য় কথা বলা ফুরোলো না। দূরে সোজা রাস্তার ওপর একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম সর্বপ্রথম আমি।

আমার মতন বেগমও একভাবে তাকিয়ে আশংকাজনক প্রশ্ন করলেন,

কি ওটা ?

—একটা সাদা কাপড়ের মতন রাস্তার ওপর দেখা যাচ্ছে না ? বল্লেন কর্ণেল।

—তাই তো মনে হচ্ছে !

আমরা একত্রে সবাই তৎপর হয়ে উঠলাম। উইণ্ড স্ক্রীনের ভেতর দিয়ে আমাদের চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠলো। সকলেই কিছু একটা…।

এমন সময় বেগম বল্লেন, রাস্তার উপর কোন চর দাঁড়িয়ে নেই তো ? কোন স্পাই ? গুপ্তচরেরা ঠিক খবর পেয়ে যায় !

হোসেন সাহেব অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথাটা উড়িয়ে দিলেন।

কর্ণেল বল্লেন, সব বাজে কথা !

কিন্তু ব্যাপারটা যে কি আমার মাথায় আসছিল না। খুব গুরুত্ব না দিলেও বেগমের কথায় আমি একটু সাবধানী হয়ে পড়লাম। কে জানে রাস্তায় কত কিছু-ই তো ঘটতে পারে। ঘটেই তো।

মেয়েরা কি বিপদের সংকেত পুরুষের আগে পেয়ে যায় ?

সত্যিই কি আমাদের সামনে কোন বিপদ ? একবারে নির্জন নিরালা, চারদিকে ফাঁকা মাঠ। ছোট একটা জীপে আমরা চারজন শুধু। যুদ্ধ নেই, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থা এখনও !

বেগম এসময় এ কথাটা না বল্লেই বোধ'য় ভাল করতেন। কর্ণেল বেপরোয়া গাড়ি চালালেন। হোসেন সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বসে রইলেন। আর আমি এবং বেগম এ্যাডভেঞ্চারের দমচাপা উত্তাপ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

গাড়ি হুড়মুড় করে এসে পড়ল স্পটে।

একটা পৈশাচিক হাসির প্রতিমূর্তি !

কর্ণেলের পিস্তল গর্জে উঠলো হঠাৎ—নন্‌সেন্স !

সঙ্গে সঙ্গে মাটির খুলিটা ঠাঁই-ই শব্দে ভেঙ্গে গিয়ে মাঠে মাঠে প্রতিধ্বনি হয়ে ছুটে চল্লো !

হো-হো করে হেসে উঠলেন মোতায়ের হোসেন।

—বেশ করেছে। একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সকলকে। বল্লেন বেগম।

—কর্ণেল কিন্তু ভয়ের চেয়ে রেগেছেন বেশী। তা না হ'লে মাটির হাঁড়িকে অমন গুলী করে চৌচির করে দেয় !



—দেওয়াই উচিৎ। দাঁতাল মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। কে ওকে বোকার মত রাস্তার মাঝে খাড়া করে রেখেছে। বেগম এবারও কর্ণেলের পক্ষ নিলেন।

হোসেন সাহেব বল্লেন, হয়তো কোন গরীব চাষী যত্ন করে একটা ক্ষেত-পাহারা তৈরী করেছিল।

—যত্নেই হোক অযত্নেই হোক কাজটা মোটেই ভাল করেনি। গাড়িতে ফিরে এসে বল্লেন কর্ণেল।

—এটা ওয়ার পিরিয়ড। তাছাড়া কাছাকাছি ধানক্ষেত কই ? আমি সামান্য সমর্থন করলাম কর্ণেলকে।

আবার গাড়ি ছুটলো। ক্রমশঃ সীমান্তের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। দূরে মিলিটারীদের ছাউনিগুলো চোখে পড়ছে। হয়তো রণাঙ্গনের কোন ছবিও চোখে পড়বে সামনে।

বেগম আবার একটুকরো কথা কুড়িয়ে আনলেন, আপনি কখনো রাজাকর দেখেছেন ?

আচমকা প্রশ্ন, কিন্তু লক্ষ্য— ?

পাশ থেকে কর্ণেল চড়া গলায় উত্তর করলেন, কেন দেখবো না।

—কেমন দেখতে ? কোথায় দেখেছেন ?

—কেন। আমাদের মতই। ধরুন আমাদের মধ্যেই কেউ একজন !

আমার একপ্রস্থ দমকা হাসি। কর্ণেল, মোতায়ের হোসেন, বেগম পর্যায়ক্রমে হেসে চল্লেন।

কেবল সেই মুহূর্তে উইণ্ড স্ক্রীণের ভেতর চোখ রেখে আমি তাকিয়ে রইলাম। সীমান্তটা আর কত দূর…। সময়টা আর কত দূর। রাস্তা ?

*With the compliments of*

Phone Rai-12

**RAIGANJ CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.**

**P. O. RAIGANJ, DT. W. DINAJPORE**

**BRANCHES**

**ISLAMPUR ● BUNIADPUR**

Published by Shri Swapan Majumdar and edited by Bhaswati Raychaudhuri from 35B Charu Avenue, Calcutta-700033 and printed at Tollygunje Press, Cal-33

Re. 1·50 P.